SARANIK

COLLEGE MAGAZINE

2022-2023

KISHORE BHARATI BHAGINI NIVEDITA COLLEGE (CO-ED)

সারণিক

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড)

বার্ষিক পত্রিকা

২০২২-২০২৩

সম্পাদক মণ্ডলী

ড. শিপ্রা ঘোষ

ড. অর্পিতা সেনগুপ্ত সাধু

From The Principal's Desk

It is with great pride that I present to you the latest edition of our college magazine "SAARANIK", for the academic year 2022-23. This magazine serves as a vibrant tapestry woven from the diverse talents, creativity and hard work of our students and faculty.

In these pages, you will find a rich collection of articles, essays, poems and artwork that reflect not only the academic pursuits but also the unique perspectives and experiences of our college community. This year's edition embodies our commitment to fostering creativity and critical thinking, encouraging our students to express themselves and share their voices.

I extend all my gratitude to all contributors and members of the magazine committee, who have made this publication possible..

Thank you all.

Dr. Shib Sankar Sana,
Principal, KBBNC.

পরিচালন সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা (কো- এডুকেশন) কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে কলেজের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা সারণিক-এর প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। দুঃসহ মহামারী কালের বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কলেজ খুলেছে, কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ হচ্ছে , এটা অত্যন্ত আনন্দ ও খুশির কথা।

পত্রিকাটি যাতে আগামীদিনে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের একটি যথাযোগ্য আধার হয়ে ওঠে , সেটা যেমন সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব, তেমনি সমাজ-ভাবনামূলক গদ্যচর্চাকে উৎসাহিত করা পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব।

পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৬ই জুন, ২০২৩

সম্পাদকীয়

২০২২ এর শুরুতেও ওমিক্রনের হানাদারিতে সন্ত্রস্ত ছিলাম আমরা। এখন আবার পৃথিবী তার স্বাভাবিক ছন্দে এসে দাঁড়িয়েছে। অতিমারি পর্বের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও বেদনার দিনগুলি পার হয়ে এসেছি সবাই। এখন আবার সবকিছু নতুন করে গড়ে তোলার সময় হলো। যা কিছু ক্ষত-ক্ষতি, তাকে সারিয়ে তুলে চলিষ্ণুতার মন্ত্রে এগিয়ে চলা। ২০২০- ২১এ সম্পূর্ণ এবং আংশিক দীর্ঘ লকডাউনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ মানুষের রুজি-রোজগার এবং শিক্ষা। আমাদের চোখের সামনেই কয়েক প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে করোনার প্রত্যক্ষ ধাক্কায়। অনলাইন শিক্ষা অর্জনের পথে বিপুল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দারিদ্র; ক্রমাগত নেট কিনে যাওয়ার অসামর্থ্য। অবশেষে প্রত্যক্ষ ক্লাসরুম টিচিংয়ে ফিরে এসে শিক্ষক- ছাত্র উভয়েরই স্বস্তি মিলেছে ।

আমাদের দেশ একটু একটু করে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নেবে ঠিকই একদিন। কিন্তু আরেকরকম ব্যাধি পৃথিবীকে সত্যিই ততটা ভালো থাকতে দিচ্ছে না। রাষ্ট্রশক্তিগুলির লোভ ও আগ্রাসন পারস্পরিক হিংসা ও হানাহানি পৃথিবীকে চিরকালই বোধ হয় অশান্ত করে রাখবে। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিত, ইউক্রেনে রাশিয়ার হানাদারীর ফলে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা রাশিয়া সম্পর্কে আমাদের সাধারণ আবেগকে ধ্বংস করেছে। পুতিনের আগ্রাসী হিংস্রতা, চীনের মদত এবং অন্যদিকে জেলেনস্কির অনমনীয় মনোভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতিতে এই যুদ্ধের আগুন ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। এর প্রশমন কবে হবে, তা জানিনা কেউই।

ভারতেও অশান্তির মেঘ। মণিপুর হাইকোর্ট অ-উপজাতীয় মেইতি সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির (এস.টি.).ভুক্ত বলে গণ্য করায় এবং পূর্ববর্তী একটি সরকারি নির্দেশ অনুসরণ করার সুপারিশ করলে, মণিপুরে যে ভয়ানক সহিংস সম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়েছে মেইতি ও নাগা কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে, তার রেশ শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, সামাজিক এবং মানবিক দিক থেকে একটি ভয়ানক অশনি-সংকেত নির্দেশ করছে।

কলেজের তরুণ ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে পৃথিবী ও নিজের রাষ্ট্রের এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ- দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। তাদের মানবিক এবং মুক্ত' দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার লক্ষ্যেই, বিভিন্ন সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই এই বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে তারা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান ও সৃষ্টিকে অবাধে মেলে ধরতে পারে। সে- কথা মনে রেখেই এবারের সারণিক প্রকাশের প্রয়াস-।

শিপ্রা ঘোষ।
কলকাতা, ২০২৩।

"এত বড় আকাশ তলে জীবন এতো ছোট কেনে"

নবনীতা মান্না, থার্ড সেমিস্টার, ২০২২ ২৩

আমরা নিজেরা তো জানিই, সেই সঙ্গে এই আকাশ- বাতাস -মাঠ- ঘাট, প্রকৃতির সবাই বোধহয় জানে যে, এই জীবন ছেড়ে কোন- না- কোন দিন চলে যেতেই হবে আমাদের। ইচ্ছে তো করে যে, নিজের নিজের জীবনটাকে এত বড় আকাশের নিচে আকাশের মতই বড় করে তুলি। বেড়ে যাক আয়ু। দীর্ঘজীবী হোক প্রকৃতির সঙ্গে, আকাশ- বাতাস- গাছপালার সঙ্গে আমাদের এই পরিচয়। যে- কদিন এই পৃথিবীতে থাকি সবাই, নিজের নিজের ঘর পরিবারের সঙ্গে তো বটেই, সেই সঙ্গে অজান্তেই আকাশ- বাতাস- নদী- নালা কাছের গাছ, দূরের বনের সঙ্গে কী করে যে এত মায়া, এত সখ্য আমাদের গড়ে ওঠে, যে ভাবতেও পারি না, এক মুহূর্তে এইসব ছেড়ে চলে যেতে হবে। যেন মাত্র একবেলার দেখাশোনা এখানে।

যতই চাই, তবু কখনোই এই পৃথিবীর সঙ্গে চিরস্থায়ী আয়ুতে বাঁধা থাকবো না কেউই। অগত্যা মন চাক, আর না-ই চাক, আমরা নিজেদের জোর করে বুঝিয়ে নিই যে, এই মাটিতে আমাদের আসা যেমন, যাওয়া তেমনি অকাট্য এক সত্য। আর এটা জানলেই যেন গোটা পৃথিবীকে- জীবনকে আরোই ভালোবেসে ফেলি আমরা। আরোই ঘিরে ঘিরে থাকতে চাই এই প্রকৃতি এবং জীবনকে।

নিজেদের ছোট গন্ডিতে ঘেরা জীবনের মধ্যে থাকতে থাকতে, যখন আকাশের দিকে তাকাই, তখন তার বিরাট মহিমা শুধু যে অনুভব করি তাই না, নির্জন বিরাট আকাশের দিকে তাকালে মনে যেন অনেক পুরনো দিনের কথা-, সেসব কোন গত জন্মের কথা যেন, মনে পড়ে যায়। অনেক কালের ভুলে যাওয়া স্মৃতি মনে আসে। মেঘে- ঢাকা- আকাশ, সকালের কুয়াশা- ঘেরা মাঠ, বিকেলের সূর্যাস্তের লাল আকাশ আমাদের জীবনের অনেক জন্মকাল আগের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। মনে হয় যতটা ভয় পাই জীবন যেন ততটা ছোট নয়, এই আকাশের নিচে কত কত কাল ধরে, এই নির্জন মাঠ বা নদীর কাছে কত কত জন্ম ধরে, ঘুরে বেড়িয়েছি যেন। কতসব মুহূর্তে অচেনা পথ, অচেনা নদীর সামনে দাঁড়ালেও মনে হয়, একে যেন চিনি,- দেখেছি কোথাও। কবে, তা ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু কখনো এসেছি এ পথে, হয়তো আবার আসব। আজকের এই নাম বা রূপে নয়। হয়তো কুয়াশা বা মেঘ হয়ে, সবুজ ঘাস বা পাহাড়ি নির্জন ঝরনা হয়ে, এই আকাশের নিচেই ফিরে আসবো আবার। বিরাট আকাশ তলে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবী আর মাটি ছেড়ে যাব না কখনো। যেতে চাই না। দুহাত বাড়িয়ে আয়ুকে বড় করে তুলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না কেউ । "জীবন এত ছোট কেনে"।

রবীন্দ্রনৃত্য, একটি ঘরনা

ঐন্দ্রিলা মান্না।
বাংলা স্নাতক , সাম্মানিক, পঞ্চম সেমেস্টার।

রবীন্দ্রনৃত্য, এটি একটি ঘরনা কিনা, এই বিষয়টি আলোচনা করার পূর্বেই আমাদের জেনে নেওয়া উচিত বা দরকার যে ঘরনা কী বা ঘরনা বলতে কী বোঝায়? ঘরনা বলতে বোঝায় কোনো একটি নৃত্য বা বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নৃত্যের আঙ্গিক বা রীতিকে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ভরতনাট্যম নৃত্যের আবিষ্কার হয় দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর তাঞ্জর অঞ্চলে তাই প্রথমে ভরতনাট্যম যে আঙ্গিকে করা হত টা হল তাঞ্জর ঘরনা পরবর্তীকালে কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা মিনাক্ষী সুন্দরম পিল্লাই এবং বলা সরস্বতী নৃত্যের আঙ্গিকের একটু পরিবর্তন ঘটান এবং তখন নাম হয় কলাক্ষেত্র ঘরনা। এর অনেক পরে যখন দুই শিক্ষাগুরু গোবিন্দান কুট্টি এবং থানকুনি কুট্টি ওনারা আবার নিজেরা নৃত্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের নৃত্য সংস্থার নাম দেন কলামণ্ডলম। এর থেকে পরবর্তী আর এক ঘরনার নাম হয় কলামন্ডলম ঘরনা। এরপর আসা যাক রবীন্দ্রনৃত্যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডের কথা আমরা কম,বেশি সকলেই জানি। তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যে নৃত্য ভাবনা তাঁর এক অনবদ্য ভাবনা। এই কথা বললে ভুল হবে না যে এই ভাবনাটি তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তাধারা যা শুরু হয়েছিলো শান্তিনিকেতনের মাটিতে। শুধুমাত্র নৃত্যকে একটি শিল্প হিসেবে বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই উদ্যোগে ব্রতী হলেও বর্তমানে তাঁর নৃত্যকলা নিজ মহিমায় সারা বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে। এই নৃত্যকে নিয়ে এগিয়ে চলার পথটি প্রাথমিক পর্যায়ে খুব মসৃন নয়, এই কথা বুঝতে পেরেই স্বয়ং তিনি এই শিল্পের সাথে সরাসরি নিজেকে যুক্ত করেন। এই নৃত্য একটি মুক্ত অঙ্গনের মতো যেখানে দেশ-বিদেশের নানা নৃত্য এসে মিলেমিশে রবীন্দ্রনৃত্য নামক একটি ধারায় বয়ে চলে যা খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনৃত্যের মধ্যে নানাবিধ নৃত্যশৈলীর সমাগম ঘটেছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে শুরু করে লোকনৃত্য, ইউরোপীয় নৃত্য আঙ্গিক, এমনকি শ্রীলঙ্কার নৃত্য আঙ্গিক নৃত্যশৈলীও মিলেমিশে গেছে একেবারে এই নৃত্যে। যেমন- *পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় ছুটে আয় আয় আয়।* এই গানটির মধ্যে আমরা লোকসঙ্গীতের ভাব দেখতে পাই। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ভরতনাট্যম, মণিপুরী, কথাকলি কিছুটা পরিমাণে মোহিনীঅট্টম এই রবীন্দ্রনৃত্যে উপস্থিত। বিশেষ করে মণিপুরী নৃত্যে বেশি ব্যবহার করা হয় রবীন্দ্রনৃত্যে। রবীন্দ্রনৃত্যে যে সব নানা রকম নৃত্যশৈলীর সমাগম ঘটেছে তার মধ্যে কোনো নৃত্যশৈলীরই প্রথাগত ব্যাকরণ মানা হয় না কারণ রবীন্দ্রনৃত্য আশ্রয় করে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে,সেই সঙ্গীতের ভাব,সুর,তাল,ছন্দ, লয় এই সমস্ত কিছুকে সঠিকভাবে দেহের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করাই হল রবীন্দ্রনৃত্য। তাই রবীন্দ্রনৃত্যের ক্ষেত্রে দেহের সুষম ভঙ্গিমা তৈরি করার জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীতের নিরিখে শাস্ত্রীয় নৃত্য গুলির বিশুদ্ধতা প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার প্রয়োজন পরে অর্থাৎ রবীন্দ্রনৃত্যের নিজস্ব কোনো ঘরনা নেই। রবীন্দ্রনৃত্য একটি নিজস্ব নৃত্যশৈলী। ঘরনা আছে শুধুমাত্র শাস্ত্রীয়নৃত্যে। রবীন্দ্রনৃত্য সৃষ্টি তখনই হয় যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নৃত্যভঙ্গিমা একে অপরের পরিপূরক হয়। এখানে বলা যেতে পারে মনিকাঞ্চন যোগের কথা অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছাপিয়ে যেমন রবীন্দ্রনৃত্য এগিয়ে যাবেনা তেমনই রবীন্দ্রনৃত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছাপিয়ে এগিয়ে যাবেনা এরা দুজন দুজনের সহোদর হয়ে বিরাজ করবে একই আসনে।

রবীন্দ্রনাথের গান ; বর্তমান প্রজন্ম কম শোনে?

সঙ্গমিতা দত্ত
বাংলা অনার্স, ষষ্ঠ সেমিস্টার

গান। অনেক না বলা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় এই গানের মাধ্যমে। তাছাড়া অনেক মন খারাপের গান চোখের জলের তরী বেয়ে চলে। আনন্দ উৎসবে পা মেলাতেও প্রয়োজন পড়ে এই গান। শিশুকে ঘুম পাড়াতেও মায়েদের অস্ত্র হয় এই গান। তাছাড়া প্রতিবাদের সুর ও জন্মায় এই গান দিয়ে।

ছোটো থেকে শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি গান - নাচ - আঁকা সবকিছু শেখানো হয়। আর এই গান নাচে হাতে খড়ি হয় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি দিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রনৃত্য এগুলি হয়ে ওঠে আমাদের স্লেট পেন্সিল। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত, হয়তো আজীবনই, আমরা রবীন্দ্রনাথকে সাথে নিয়ে থাকি।

আসলে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে। জীবনের আনন্দ-বেদনা, উৎসব এমন কোন পর্ব এমন নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ নেই।

এই ধরুন ছোটবেলায় আধো আধো গলায় ক্ষ্মহারে রে রে রে রে /আমায় ছেড়ে দে রে দে রে। যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে" কিংবা ''মম চিত্তে নিতি নৃত্যে/কে যে নাচে/তা তা থৈ থৈ" আবার বন্ধুর জন্য ''আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরিক্ষ্ম আবার কোনো ঝড়ো হাওয়ার দিনে মনে পড়ে ক্ষ্মপাগলা হাওয়ার বাদল দিনে/পাগল আমার মন জেগে ওঠেক্ষ্ম বৃষ্টি পড়লে মনে পড়ে ক্ষ্মমন মোর মেঘের সঙ্গী/উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানেক্ষ্ম বা ক্ষ্মশ্রাবণের ধারার মতন পড়ুক ঝরেক্ষ্ম। জীবনে অনেক পথ আমরা কাউকে পাশে পাইনা তখন একা চলার সময় নিজেকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্য ক্ষ্মযদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রেক্ষ্ম এই গান গেয়ে নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। প্রেমের প্রস্তাব রাখতে ক্ষ্মআমার পরান যাহা চায়/তুমি তা-ই তুমি তা-ই গোক্ষ্ম

এখন বিচার্য বর্তমান প্রজন্ম রবীন্দ্র সংগীত শোনে কি? এখনের প্রজন্ম আধুনিক। তারা বছরে শুধু দুই দিন রবীন্দ্রনাথকে মনে করে এক রবীন্দ্রজয়ন্তী দুই ২২ শে শ্রাবণ। বাকি দিনগুলো আধুনিক সংগীত যথা বলিউড পপ জনরে চিপ থ্রিলস জাস্টিন বিবার হিপহপ রক মিউজিক ব্যান্ড তথা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জোয়ারে গা ভাসিয়ে রবীন্দ্র চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আসলে বর্তমান প্রজন্ম রবীন্দ্রসঙ্গীত যে একদমই শোনে না তা বলা ভূল। ইনস্টাগ্রামের reels কিংবা স্টোরি এবং অনেক জনপ্রিয় সংগীত মঞ্চে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাই তবে তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকে। যেমন অরিজিৎ সিঙ্- এর গলায় গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শান বা মান্না দের থেকে বেশি পছন্দ করে। বর্তমান প্রজন্ম পুরোনো ঐতিহ্যকে বদলে আধুনিকতায় মেতে উঠেছে। তারা সবকিছুতে আধুনিকতা খোঁজে। ঠিক তেমনি তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত তারা পছন্দ করে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা দেখেও থাকি তবে অন্যরকম ভাবে। আসলে সময়ের সাথে সাথে পোশাক স্বাদ সবকিছু যেমন পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক তেমনি গানকেও নিজেদের মতন করে নিচ্ছে তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্তমান প্রজন্ম শোনে অনেক কম। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ছাত্র কর্মরত মানুষের ব্যস্ত জীবনে সময়ের অভাবে সঙ্গীতচর্চা খুব কম করে আর যেটুকু করা তা পুরোপুরি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপরে নির্ভর করে।

RACIAL DISCRIMINATION
“SRIJEETA BHATTTACHARYYA,
DEPT. OF ENGLISH“

“Racial discrimination or racism as we habitually call it, is a huge problem faced in the United States. The African Americans or black Americans, in spite of constituting to one of the largest ethnic groups, face racial discrimination in their day to day lives. Such is the story of George Floyd. The event is real and has surely shook the world up.“On May 25, 2020, a 46 year old man named George Floyd was mercilessly murdered in public by Derek Chauvin, a white police officer. Floyd had been accused of forgery for buying cigarettes by producing a counterfeit $20 bill to a store clerk. He was immediately arrested, handcuffed and Chauvin knelt on Floyd’s neck for quite some time until Floyd breathed his last due to an immense breathing difficulty. While this homicide was being committed in Minneapolis, brutally, blatantly in broad day light, no bystander or passer-by could do anything to prevent George from the clutches of Chauvin.“There were three other officers involved in the incident and they were all fired the next day along with Derek Chauvin. Justice was partially served when Mike Freeman, the Hennepin County Attorney announced third-degree murder and second-degree manslaughter charges against Derek Chauvin after vividly examining the videos.“Like every action has an equal and opposite reaction, this too escalated. The Blacks in America felt threatened. It opened the eyes of the common people regarding police brutality and even more RACISM! Hardly had the global pandemic downshifted when out of nowhere a heart-breaking footage of a black man took the world by storm. Protests, mob attacks, strikes, matches were all over.“I believe the murder of George Floyd is an awakening, a revelation and definitely an exposure as to what the government, the police as well as the common man are capable of. If not anything, it has surely traumatized the Blacks reminding them of their tragic past. If there is anything that has threatened mankind since time immemorial, it is social evil. It has taken lives, countlessly without a pause. Hence, the world saw George dying and could do nothing about it. George unquestionably died a painful death. A death he did not deserve.

Photography: Dr. Arpita Sengupta Sadhu, Departmennt of Physiology. Zanskar Range from Dain Kund Himachal Prades

আশ্রমের শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

সুদক্ষিণা ঘোষ

১.

"..আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা।" প্রকাণ্ড সমারোহময় বিদ্যাশিক্ষার নিষ্ফল আড়ম্বরের নিরানন্দ কৃত্রিমতায় কেমন করে পদে পদে ব্যর্থ হয়ে যায় শিক্ষার্জনের যথার্থ প্রয়োজন, 'পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ'-করা মুখস্থ বিদ্যা-অর্জনের প্রয়াসে কেমন করে নিরর্থক হয়ে যায় আমাদের চলিত শিক্ষার আয়োজন– তারই একটা ছবি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'তোতাকাহিনী' নামে তাঁর এই বিখ্যাত ব্যঙ্গ-আখ্যানটিতে, ইংরেজি অনুবাদের সময় যে আখ্যানটিকে তিনি নিজেই বলেছিলেন allegorical satire। বিদ্যাশিক্ষার আয়োজনকে ঘিরে খুব তো সুখকর ছিল না রবীন্দ্রনাথের নিজের ছেলেবেলার ছবিটিও– সেই একই ক্লান্তিকর আনন্দহীন নিরর্থকতাই ছিল তাঁরও ছেলেবেলা জুড়ে, ইস্কুলের কলের মধ্যে চার-দেওয়ালের একঘেয়েমিতে দিনে দিনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক 'ইস্কুল-পালানো-ছেলে'।

কিন্তু ইস্কুল-পালানো সেই ছেলেটি যখন নিজেই গড়ে তোলেন এক ইস্কুল, তখন এমনটাই তো সত্যি হয়ে ওঠার কথা যে–না-পাওয়ার যে বেদনায় একদিন ইস্কুল পালিয়েছিলেন তিনি, সেই অভাব, সেই অতৃপ্তি আর থাকবে না তাঁর গড়া ইস্কুলে; এমন এক শিক্ষায়তন গড়বেন তিনি যেখানে হারিয়ে যাবে না কোনো শিশুর প্রাণের সতেজতা, ইস্কুলের ইঁটের দেওয়াল আর 'কটমট করে তাকিয়ে' থাকবে না তার দিকে!

ঠিক এমনটাই সত্যি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের গড়া বিদ্যালয়ে, প্রকৃতির সাহচর্য আর শিক্ষকের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যে বেদনা শিশুকালে তিনি নিজে অনুভব করেছেন, তাঁর গড়া শিক্ষালয়ে সে-কষ্ট কোনোদিন পায় নি কোনো শিশু; শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে প্রতিদিনের পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে এমন সহজ আনন্দে গেয়ে উঠতে পারত– 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে/ আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে', সে তো এই জন্যেই যে, ইঁটে-মোড়া চার-দেওয়ালে-ঘেরা কোনো ইস্কুল কখনোই গড়তে চান নি রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর 'আশ্রম'– যার আদর্শ হিসেবে তাঁর মনের মধ্যে ছিল প্রাচীন ভারতের শান্ত তপোবনের স্মৃতি, ছিল গুরুগৃহবাসী শিক্ষার্থীবালকের স্নিগ্ধ মুখশ্রীর মায়া।

দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে মুকুলিত হয়ে উঠেছে তাঁর শিক্ষাবোধ, আশ্রম-বিদ্যালয় বাস্তবে রূপ নিতে তখনও প্রায় এক দশক বাকি, জমিদারি পরিদর্শনের কাজে রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে, নিজের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন একটি গৃহবিদ্যালয়, অনুভব করছেন প্রচলিত শিক্ষার ক্লান্তিকর যান্ত্রিকতা, মনের মধ্যে গড়ে উঠছে পরিণত এক শিক্ষাভাবনা; সেইসব ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়েই ১৮৯২ সালে রচিত হলো তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ– যে প্রবন্ধে শোনা গেল শিক্ষামনস্তত্ত্বের এক গভীর সত্যের উচ্চারণ, শোনা গেল সমকালীন নিরানন্দ নীরস শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক সমালোচনা।

এ প্রবন্ধরচনার প্রায় এক দশক পরে, ১৯০১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে ধরা দিল তপোবনের স্বপ্ন-কল্পনার ছবি, 'বাহিরে অতি অল্প আয়োজন' আর অন্তরে গভীর ঐশ্বর্য নিয়ে গড়া সেই শিক্ষাদর্শের আবহে ১৯০১ সালেই শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠল তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। অবশ্য, শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা রবীন্দ্রনাথের আগেই ভেবেছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ; বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর ১৯০১) শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নিচে সবুজে-ঘেরা-গাছের ছায়ায় মাত্র পাঁচটি বালককে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন একটি আবাসিক বিদ্যালয়–শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পরে যা রূপ নিল বিশ্বভারতী-তে, হয়ে উঠল এক বিশ্ববিদ্যালয়।

"বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়– 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন আমরা এখানে পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।" –রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকেন্দ্রিক অভিভাষণগুলির একটিতে শুনি তাঁর এই উচ্চারণ, বিশ্বভারতীকে ঘিরে কী ছিল তার স্রষ্টার স্বপ্ন, তারই একটা ছবি খুঁজে পাই জীর্ণতা-মলিনতা-সংকীর্ণতাবিহীন সেই আসনতলে পৌঁছে।

"আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা বড়ো জিনিস লাভ করছে যেটা ক্লাসের জিনিস নয়– সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার বোধ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে।.... বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের হৃদয়ের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যহ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব– এইটেকে কোনোমতে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে দেওয়া চলবে না।" শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে যখন চিঠিতে এ কথাগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন সবে একটি দশক পার হয়ে এসেছে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক শিক্ষাভাবনার এক উজ্জ্বল প্রতিরূপ ধরা আছে ১৯১২ সালে জগদানন্দ রায়কে লেখা তাঁর এই চিঠিটিতে; 'পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে'– এমন কতভাবেই দিনে দিনে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের মনকে ভরিয়ে তুলেছিলেন তিনি শরতের সোনার আলোয়, বাদলদিনের মেঘলা ছায়ায়, বসন্তের পলাশ-শিমুলের রক্তিমাভায়– শান্তিনিকেতনের মাঠে মাঠে, খোয়াইয়ের পথে পথে, কোপাইয়ের ধারে ধারে।

"ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে।" 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব রূপ নিয়েছিল তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভাবনায়। তাই ক্লাসের খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে ছেলেদের তিনি ডাক দিয়েছেন গাছের তলার ক্লাসে– কেবল নীরস পাঠাভ্যাসে ভরিয়ে তোলেন নি সে-সব ক্লাস, 'গাছে চড়ে বসে যেমন পড়া' করেছে তারা, তেমনি অবিরাম বৃষ্টিধারায় স্নান করেছে মাঠে, বেরিয়ে পড়েছে জ্যোৎস্নারাতের বৈতালিকে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে, নাচে-গানে-পাঠে ভরিয়ে তুলেছে সাহিত্যসভা আর নাটকের পালা; বিশ্বাস করেছে–'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ', আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে আশ্রমের পশু-পাখি-গাছপালা-ফুল-ফল– সবার সঙ্গে, অন্ধ থাকে নি ঋতুর পরে ঋতুর পালাবদলে– বৃক্ষরোপণে-হলকর্ষণে-বর্ষামঙ্গলে-বসন্তোৎসবে বরণ করে নিয়েছে নবীন ঋতুকে, যোগ রচনা করেছে আশেপাশের প্রতিটি গ্রামের মানুষের বয়ে-চলা-জীবনযাত্রার সঙ্গে; আশ্রমিক শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যাচর্চা হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ এক জীবনচর্চা।

মরা মন নিয়ে যারা পরীক্ষা-পাশের তালিকায় ঊর্ধ্বশিখরে পৌঁছয়, তাদের গড়ে তোলার সাধনায় কোনোদিনই মনোযোগ দেয় নি শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়। জীবন্ত মন নিয়ে এই বিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে যে ছেলেমেয়েরা, তাদের ঘিরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছিল পরিপার্শ্বের প্রতিবেশকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস। 'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল'–এ গানের সুরে শান্তিনিকেতনের ঊষর ভূমিতে শুধু বৃক্ষরোপণ উৎসবেরই সূচনা করেন নি রবীন্দ্রনাথ, শুধুই রচনা করেন নি 'বনবাণী'র বৃক্ষবন্দনার কবিতা, প্রতিদিনের দিনযাপনে জড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি প্রকৃতিকে, প্রতিবেশকে ভালোবাসবার মন্ত্র– আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের প্রতিটি বালককে শিখিয়েছিলেন আশ্রমের পথের ধারে ধারে একটি করে গাছের চারা রোপণ করতে, নিজের হাতের পরিচর্যায় সেই শিশুবৃক্ষটিকে যত্নে-আদরে বড়ো করে তুলতে; শিখিয়েছিলেন কাঠবিড়ালি থেকে শুরু করে আশ্রমের প্রতিটি পশু-পাখিকে ভালোবাসতে– বন্দী না করে তাদের ভালোবেসে নিজের পোষ্য করে তুলতে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা যে-সময়ে অপরিচিত, সেসময়ে রবীন্দ্রনাথের গড়ে দেওয়া পরিবেশ চেতনায় এমনি করেই নিতান্ত সহজভাবে তাঁর ছাত্ররা শিখেছে চারপাশের প্রকৃতি ও মানুষকে ঘিরে নিজের পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশকে ভালোবাসতে।

কল্পনাশক্তির উদ্বোধনে আর সৃজনভাবনার উজ্জীবনে আরো কতভাবেই যে শিক্ষার্থী বালকদের হৃদয় পূর্ণ করে দিতেন আশ্রমগুরু স্বয়ং, তার পরিচয় ধরা আছে আশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্রদের লেখালেখিতে। রবীন্দ্রসান্নিধ্যের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিল যে বালকেরা–তাঁদেরই একজন, প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছিলেন কেমন ছিল পুরোনো শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সান্ধ্য-বিনোদনের ধরন, জানিয়েছিলেন সেই বিনোদনে কতখানি ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; হাজার কাজের ভিড়েও নিয়মিত ছেলেদের ঘরে আসতে কখনো ভুল হতো না তাঁর, প্রমথনাথের ভাষায়– "এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ছেলেদের এক-একটি ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। নানারকম নূতন খেলা তিনি উদ্ভাবন করিতেন।....তিনি কবিতার একটা ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সংগতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত। ....আবার অনেক সময় তিনি একটা গল্পের সূত্রপাত করিয়া পালাক্রমে আমাদের চালাইয়া লইতে বলিতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দু-এক ধাপ পরেই গল্পটা ভুতুড়ে ধরনের হইয়া উঠিত, তখন তিনি ভূত ছাড়াইয়া

গল্পটাকে সংগত পরিণামে পৌঁছাইয়া দিতেন।..মাঝে মাঝে নিজের কবিতা পড়িয়া শোনাইতেন। সন্ধ্যাবেলা...নূতন গান শিখাইবার আসরও বসিত।"

এমনই আনন্দময় ছিল রবীন্দ্রনাথের সকালবেলার ক্লাসগুলিও। শিশুকে অত্যন্ত শিশু মনে করে সাহিত্যের আনন্দের ভোজ থেকে তাকে বঞ্চিত রেখে দেওয়ার ভাবনায় সায় ছিল না শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের। বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলিই অকাতরে বিতরণ করেছেন তিনি ছোটোদের ক্লাসেও; কী গভীর ধৈর্য নিয়ে দিনের পর দিন সেই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদেরও শেলি-কিট্‌স-এর কবিতা পড়িয়ে চলেছেন তিনি– বারে বারে নানা ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে ছাত্রদের মুখ দিয়েই সঠিক শব্দটি বার করে নিয়েছেন, তাদের দিয়েই তৈরি করিয়ে নিয়েছেন নতুন নতুন বাক্য, আর ঐসব শব্দ আর বাক্য জুড়ে জুড়ে ওয়ার্ড-মেকিং খেলার ছলে নিজের অজান্তেই কখন তারা আয়ত্ত করে ফেলেছে আপাত কঠিন ইংরেজি কবিতাটি; ক্লাসের পড়ার মাঝে নানান কথার খেলায় মুছে গেছে নিত্যদিনের পাঠাভ্যাসের ক্লান্তি।

এমনি করে ছাত্রদের মনকে শিক্ষিত করে তুলতে চান যিনি, স্বভাবতই তাঁর কাছে কোনো গুরুত্ব পায় নি প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি, সেই পরীক্ষাপদ্ধতির নিষ্প্রয়োজন গুরুত্বহীনতাই বরং স্বীকৃত এক সত্য ছিল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে, যে বোধ আজও হারিয়ে ফেলে নি আশ্রম-বিদ্যালয় পাঠভবন। পরীক্ষার ফলের মাঝে যাচাই আর বাছাইয়ের নির্মমতাকে পরিহার করে, অনেকের মাঝে একজনকে বেছে নিয়ে পারিতোষিকে পুরস্কৃত না করে বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ের মাঝে শান্তিনিকেতন সেদিন খুলে দিয়েছিল সহযোগিতার অনাবিল সৌন্দর্যময় এক পথ, সহযোগিতার এই নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলাই আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ বলে গভীর এক প্রত্যয় ছিল রবীন্দ্রনাথের, শান্তিনিকেতন জুড়ে ছিল এই সুযোগটিকে সার্থক করে তোলার আয়োজন।

বাইরে থেকে চাপানো নয়, চার দেওয়ালে ঘেরা নয়, ভিতর থেকে জেগে ওঠা এক শৃঙ্খলাবোধেরই সাধনা ছিল শান্তিনিকেতনের আশ্রমে, ছিল ছাত্রদের আত্মকর্তৃত্বচর্চার সুযোগ। এই বোধ থেকেই এসেছিল আশ্রম-বিদ্যালয়ের আশ্রমসম্মিলনীর ছাত্রস্বরাজ বা ছাত্রশাসনতন্ত্রের ভাবনা। স্বাস্থ্য, সেবা, সাহিত্য, আহার্য, ক্রীড়া– আশ্রমসম্মিলনীর প্রতিটি বিভাগই আজও পাঠভবনে কাজ করে চলে সারা বছর জুড়ে আর প্রত্যেকটি বিভাগের দায়িত্ব আজও নেয় ছাত্র-ছাত্রীরাই, এমনকি বিচারবিভাগের সদস্য নির্বাচনও করে তারাই, দায়িত্ব নেয় আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শৃঙ্খলারক্ষার। এই ধরনের আত্মকর্তৃত্বমূলক ছাত্রসম্মিলনীর ভাবনা দুর্লভই ছিল রবীন্দ্রনাথের সমকালে।

ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার মনোভাবই আছে শান্তিনিকেতনে ছাত্রসম্মিলনীর এই চরিতার্থতার মূলে; 'আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিদিন বিদ্যাদান করবার সময় মনে রাখব শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'–এ যে কেবল তাঁর উচ্চারণের সত্যই ছিল না, ছিল এক গভীর প্রত্যয়, তার পরিচয়ই ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের শিক্ষাভাবনায়।

"ছেলেদের মনকে চারিদিক থেকে উদ্বোধিত করে তোলো। তাদের চিন্তার জড়ত্ব মোচন করে দাও। এইটেই সবচেয়ে দরকার। আমাদের মন ছেলেবেলা থেকে কোনো খাদ্যই পায় না বলে চিরদিনের মতো তাদের ক্ষুধা মরে যায়। আমাদের ছেলেদের মন যেন উপবাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। তারা কেবল কলের শিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরোবে এইদিকে তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা প্রয়োগ কোরো না। মনের ভিতর দিয়ে জীবনের ভিতর দিয়ে তারা জগৎটাকে গ্রহণ করতে পারে এমন শক্তি এমন আনন্দ তাদের মনে সঞ্চারিত করে দাও।" আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশই ধরা আছে জগদানন্দ রায়কে লেখা তাঁর এই চিঠিটিতে। এমনি করেই 'চারিদিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে' দিয়ে, 'আনন্দের ছোটো বড়ো নানা যাতায়াতের পথ খুলে' দিয়ে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার আয়োজনকেই এমন সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিটি মুহূর্তযাপনে, এসবের আনন্দোজ্জ্বল সম্মিলনই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আশ্রমের শিক্ষা– আজও।

বঙ্গভঙ্গ -বয়কট ও রবীন্দ্রনাথ (প্রেক্ষিত 'সদুপায়' ও অন্যান্য)

ড. শিপ্রা ঘোষ,
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

১৩০০ বঙ্গাব্দে, ''ইংরাজ ও ভারতবাসী'' (গ্রন্থ- 'রাজা প্রজা') নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন টেনিসনের লেখা (Akbar's Dream) ''আকবরের স্বপ্ন'' কবিতাটির কথা। এটির উল্লেখ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, একদিন একজন মুঘল সম্রাট ভিন্ন দুটি ধর্ম ও জাতির মধ্যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, পরে সে-স্বপ্ন হয়তো ভেঙেও গেছে। কিন্তু টেনিসনের মতে সেই স্বপ্ন নাকি গেঁথে তুলছিলেন নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনকালে, পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা। আর রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, সে গাঁথনিতে আর যাই থাক, প্রেমের নিতান্ত অভাব । ভারতবর্ষে হিন্দু- মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর নিদারুণতর হয়ে উঠেছে, ওই প্রবন্ধেই একথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং এর জন্য তিনি স্পষ্টই দায়ী করেছেন শাসক ইংরেজকে। কারণ তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন যে ইংরেজরা এই বিরোধ নিবারণের কোন চেষ্টা করেনি বরং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষার বীজ বপন করে চলেছিল তারা। আকবরের পরধর্ম সহিষ্ণুতার ইতিহাস বিষয়ে, আধুনিক ইতিহাসকার হয়তো সংশয়ী হতেও পারেন, আজ হয়তো সেই ইতিহাস নতুন করে লেখা হতেও পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারবার ফিরে গেছেন আকবরের ভারত- বোধ প্রসঙ্গে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে আকবর প্রেমের আদর্শে এক করবার চেষ্টা করেছিলেন খন্ড -ভারতবর্ষকে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার ঐক্যের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করেছেন হয়ত, কিন্তু বিচ্ছেদে আক্রান্ত দুই সম্প্রদায়ের মানুষের বেদনা তারা বোঝেনি। ''আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাত ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়'', এমন কোন আদর্শের ধার ধারেনি তারা। বরং রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, যেন মানুষের হাতে হাত কড়া পরিয়ে একটা আপাত-শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছে তারা। আর ইংরেজরা যে ভারতীয়দের এই দুটি জাতির মনের মধ্যে থাকা কাঁটাতার বা বিষ উচ্ছেদ করতে পারেনি, বা করতে চায়ওনি, তার আরো একটা কারণ শনাক্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, এই শাসক -শক্তিটি মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বার্তা নিয়ে তাদের কাছে আসেনি। ''সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহেনা'' (ইংরাজ ও ভারতবাসী)। অতএব দেশের মধ্যে হিন্দু- মুসলমানের বিরোধ বেড়েই উঠেছে', কিন্তু তা নিবারণের কোন চেষ্টা শাসকের পক্ষ থেকে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই লিখেছেন ''ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে''।

''ইংরাজ ও ভারতবাসী'' প্রবন্ধটি লেখার পনের বছর পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা ''সমস্যা'' প্রবন্ধে (গ্রন্থ- সমূহ) সমকালীন হিন্দু- মুসলমান দাঙ্গা বিরোধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে তিনি তাঁর বিশ্লেষণে এ কথা যেমন স্বীকার করলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু- মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে গোড়া থেকেই বিবাদ বা বিভেদ ছিলই, তেমনি একথাও নির্দ্বিধায় জানালেন থে, সেই বিভেদ সম্পর্ক সৃষ্টি করার এবং ওই বিভেদ সম্পর্ক টেনে নিয়ে যাওয়ারও মূল দায়ে দায়ী এই গোষ্ঠী দুটিই। এ বিষয়ে তাই প্রথম থেকেই সব দায় উপনিবেশবাদী শাসকের ঘাড়ে ফেলে দিলে সেটা ইতিহাসের অসত্য হয়েই ওঠে বলে মত প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ- ''একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।'' (সমস্যা, রাজা প্রজা)। আর এই দুই গোষ্ঠীর বিভেদকে কাজে লাগিয়েই ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব-।

মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গভীর ক্ষতের মত থেকে গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ। জীবনের নানা পর্যায়ে এই প্রসঙ্গটি তাঁর আলোচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব উপলক্ষে জেগে ওঠা বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে খুব কাছ থেকে দেখার সূত্রে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের গভীরে থাকা কারণগুলি, বয়কট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও দুর্বলতা এবং সামগ্রিকভাবে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে নানা বিশ্লেষণ ও প্রশ্ন যেন এক নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার মত তাড়া করে বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। আর এই বিষয়ে ব্রিটিশের কূটনীতির সঙ্গেই, ভারতে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাসকারী তবু পারস্পরিক ব্যবহারে বিচ্ছিন্ন দুটি সম্প্রদায়ের নিজেদের দায় ও দায়িত্বকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ''সমূহ'' বইটিতে 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'তে দেওয়া 'সভাপতির অভিভাষণে' (১৩১৪) দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবিচ্ছেদ প্রস্তাবের অনতিঅতীতের ঘটনাটি তুলে ধরে, ''পরের (অর্থাৎ ইংরেজের) কৃত বিভাগের'' সামনে কীভাবে আমাদের ''আত্মকৃত বিভাগের'' সব সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে, ঘরের মধ্যে নিজেদের আশ্রয়স্থানকে নিরুপদ্রব রাখা যাবে, সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ''কত শত বৎসর'' হিন্দু মুসলমান একই দেশকে ''মা'' বলে জেনেও মিলনে একত্র হতে পারেনি, এটা যে ভারতবর্ষের পক্ষে গভীর উদ্বেগের কথা এবং এর জন্যই দেশের কোন মহৎ আশা সম্পূর্ণ সফল হবে না, এমন উদ্বেগও সেদিন নিজের ভাষণে ব্যক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, হিন্দু- মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায় ছাড়াও তৃতীয় শক্তির প্ররোচনা আছে হিন্দু মুসলমানের বিরোধে। এই তৃতীয় শক্তি ক্রমাগত ''বাহির হইতে'' ওই দুই সম্প্রদায়ের প্রভেদকে বিরোধে পরিণত করার চেষ্টা করছে, এ কথা জেনেও, তিনি ওই অনৈক্যের বিষের জন্য বাইরের শক্তি বিশেষকে নয় বরং ওই দুই সম্প্রদায়ের নিজেদের ভিতরের ব্যবধানকেই দায়ী করেছেন। বাইরের শক্তি বা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ইন্ধন নিয়ে তেমন চিন্তার কোন কারণ বোধ করেননি তিনি , কারণ তিনি জানতেন যে রাজ সরকারেরও

এই ভয় থাকার কথা যে, ''প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনদিন কোন দিক হইতে তাহা রাজবাড়ীরও অত্যন্ত কাছে গিয়ে পৌঁছিবে''। তবে এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশের রাজনৈতিক প্ররোচনার কথা অস্বীকারও করা যায় না।

''সদুপায়'' (সমূহ, রচনাকাল ১৩১৫) প্রবন্ধটির সূচনায়, করকচ লবণ ও বিলাতি লবণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলেছেন যে বেশি অর্থ ব্যয় করেও দেশীয় মুসলমানরা যে বরিশালে বিলিতি লবণ কিনছেন সেটা তাদের জেদের বশেই..। নিজেদের সুবিধে অসুবিধের বিষয়টাকে এক্ষেত্রে গৌণ করে তুলেছে তারা। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, নমঃশূদ্রদের মধ্যেও বিলিতি বয়কটের দিনে বিলিতি পণ্যে ঝুঁকে থাকার একটি জেদ লক্ষ করা গিয়েছিল। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালির পক্ষ থেকে বিলিতি পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়', শূদ্র সাধারণ ও মুসলমান জনসমাজ তাতে সাড়া দেওয়ার কোনো অন্তর্গত তাগিদ অনুভব করেননি।

ভারতবর্ষের সমাজ গঠনের অভ্যন্তরের ঐক্যমূলক সত্যতা বিষয়ে একদিন যথেষ্ট গৌরব ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। ''স্বদেশ'' বইটির ''ভারতবর্ষের ইতিহাস'' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, এ দেশ ''পর বলিয়া কাহাকেও দূর করে নাই''। কিন্তু ক্রমশই ভারতবর্ষের হানাহানি ও সংঘাতের বাস্তবটি রবীন্দ্রনাথের মনের এই আদর্শায়িত ছবিটিকে সরিয়ে দিচ্ছিল। অঘ্রাণ, ১৩২৪-এ প্রকাশিত ''ছোট ও বড়'' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে।... ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না।'' ধর্ম যেখানে নিছকই ধর্মমতকে বহন করে , সেখানে খ্রিস্টান এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা অন্যধর্মের সঙ্গে কোনভাবেই মিলতে চায় না, অত্যুগ্র বিরুদ্ধতা রচনা করে অন্যের ধর্মকে তারা সংহার করে— একথা ঐ প্রবন্ধেই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ উপনিবেশের সূত্রে খ্রিস্টীয় আগ্রাসনের দৌলতে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা গেছে। কিন্তু ধর্মমতের এই স্পষ্ট বিরোধের চেয়েও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু- মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে যে আচারগত বিভেদের মেরুপ্রমাণ দূরত্ব, তাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং এই আচার- মূলক ধর্মের বেড়া যে আসলে হিন্দুসমাজই কষে উঁচু করে বেঁধেছে, আর এর দ্বারাই অন্য ধর্মের সঙ্গে, বিশেষত মুসলমান ধর্মের সঙ্গে, নিজের ব্যবধানকে সামাজিক ক্ষেত্রে অতি প্রত্যক্ষ করে তুলে, পদে পদে হিন্দু নিজেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এটা খুব স্পষ্ট চোখে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের। মুসলমানের পক্ষে যেখানে ধর্মমতের বাধা প্রবল, হিন্দুর পক্ষে সেখানে সামাজিক আচারগত বাধা বড়। ''এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে।'' (হিন্দু মুসলমান, শ্রাবণ, ১৩২৯')। জমিদারির কাজ দেখাশোনার সময় পল্লী অঞ্চলে গিয়ে হিন্দু মুসলমানের সামাজিক সম্পর্কের ব্যবধান জেনেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন যে, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দেওয়ার সময় ''জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হতো'' (হিন্দু মুসলমান, কালান্তর)।

দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এই বিভেদের কথা দিয়েই করকচ লবণ ও বিলিতি লবণ প্রসঙ্গে শুরু হয়েছে ক্ষ্মসদুপায়ক্ষ্ম প্রবন্ধটি। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বয়কট নীতিকে সামনে রেখে বিলিতি পণ্য বর্জনের যে হিড়িক শুরু হয়েছিল, তারই একটা অঙ্গ ছিল বিলিতি লবণ বর্জন। এছাড়া বিলিতি বস্ত্র বয়কট করা, জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি পথ তো ছিলই মূলত সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনই এই বয়কটে উৎসাহী হয়েছিলেন এবং অবশ্যই এঁরা ধর্ম মতে মূলত হিন্দু। কিন্তু বয়কটের সময় এরা মুসলমান সম্প্রদায় এবং হিন্দু নমঃশূদ্রদেরও একত্র হবার জন্য ডাক দিলেন। কারণ শাসকের কাছে সংখ্যার বিশালতা প্রমাণ করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার একটা দায় তাঁদের ছিল। কিন্তু সমস্যা হল নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্র বলে যারা জেনেছিল এবং যারা কোনদিনই শূদ্র ও মুসলমানদের সম্মানজনক সামাজিক অধিকার দেয়নি,- এখন যখন দায়ে পড়ে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের সাহায্যের দাবি করল, তখন স্বভাবতই দীর্ঘদিনের এই অবমানিত মানুষগুলি ওই প্রস্তাবে সাড়া দিল না এবং বয়কটের প্রতি নিজেদের অসমর্থন তারা যেন জেদ করে বুঝিয়ে দিল, বয়কটের মুখে বিলিতি পণ্য ব্যবহার করে। দেশি লবণ ফেলে কোন কোন মুসলমান ও নমঃশূদ্ররা বিলিতি কাপড় বিলিতি লবণই ব্যবহার করে চলেছে, এই খবর দিয়েই শুরু হয়েছে ''সদুপায়'' প্রবন্ধটি।

বঙ্গভঙ্গের সময় যে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ক্ষ্মরবীন্দ্র জীবনীক্ষ্মতে তাকে বিপ্লব বলে উল্লেখ করেছেন (রবীন্দ্র জীবনী', দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন, বিশ্বভারতী , ১৯৭৭ পৃষ্ঠা ১৪২)। সেই বিপ্লবের আগুনের আঁচ সেদিন বাংলাদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও, তার নেতৃত্ব ছিল শুধু শিক্ষিত জনের হাতেই। ড. সুমিত সরকার তাঁর আলোচনায় নির্দিষ্ট তথ্য সহযোগে দেখিয়েছেন যে, বিশ শতকের একেবারে প্রথম ভাগে শিক্ষিত ও ভদ্রজনকই জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল '(আধুনিক ভারত; ডঃ সুমিত সরকার, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি)। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিকে আরো বেশি কর্তৃত্বমূলক করে তোলার আকাঙ্ক্ষায়, ভারতীয়দের তৎকালীন রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতা ও আন্দোলনের প্রয়াসকে নিতান্তই গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন কার্জন। বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর করার সময়ে এই ঔদ্ধত্য নিয়েই কার্জন হিন্দু মুসলমান বিভাজনে উস্কানি দিয়েছিলেন, একথা আজ ইতিহাসসিদ্ধ।

মুসলমানদের কাছে কার্জন বঙ্গভঙ্গের এমন এক সুফল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন, যা অনতিভবিষ্যতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং যে ঐক্য তারা প্রাচীনকালের মুসলমান সুবাদার ও রাজাদের পরে আর ভোগ করেননি। (আধুনিক ভারত

ডঃ সুমিত সরকার, পৃষ্ঠা ৯০)। সেই সঙ্গেই পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার প্রভাবশালী হিন্দুরাজনীতিবিদদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাও কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতির একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল(ঐ, পৃষ্ঠা - ৯০) । কার্জন অবশ্য বাংলার ঐক্যবোধের শক্তি সেদিন অনুমান করতে পারেননি। উনিশ শতকের জাগরণের পর যে কলকাতা-নির্ভর সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে বাংলাদেশীয় বা আঞ্চলিক এক গরিমা এনে দিয়েছিল, তার কারণেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব শোনা মাত্র সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়াস শুরু করেছিল বাঙালি। বিশেষত ছাত্রসমাজ এই ঐক্য প্রয়াসে এগিয়ে এলে কার্লাইল সার্কুলার জারি করে সরকার ছাত্রদের আন্দোলন দমনের নানাবিধ ব্যবস্থা নিলে ছাত্ররাও সরকারি প্রতিষ্ঠান বয়কট করে। জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের কথা ভাবা হল তখন। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পিকেটিং ও বয়কটের কথা ঘোষণা করে কেউ কেউ ভাবলেন এই পথে ব্রিটিশদের ম্যাঞ্চেস্টার- নির্ভর অর্থভাণ্ডারে টান দেওয়া যাবে। আর এইসব রাজনৈতিক আন্দোলনের উন্মাদনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, শুধু বাইরের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়, দেশের ভদ্র শিক্ষিত নগরবাসী সমাজের সঙ্গে অশিক্ষিত স্বল্প- শিক্ষিত সাধারণের হৃদয়ের মিলকে একেবারে ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ''পরিশিষ্ট'' প্রবন্ধগুচ্ছের নানা প্রবন্ধের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, এই সময় রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তার মধ্যে দুটি হল

ক. শিক্ষিত ও ভদ্রজনের মধ্যে অন্তরাল ও ব্যবধান । ''আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহা- সমুদ্রের ব্যবধান।'' (ব্যাধি ও প্রতিকার, পরিশিষ্ট, পঞ্চম খন্ড', রবীন্দ্ররচনাবলী, সুলভ, পৃষ্ঠা ৭৮৬)

খ. ''এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়; আমরা বিরুদ্ধ।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮২) এই উভয়কোটির মানুষকে দেশের ভদ্রজন যতক্ষণ না প্রেমসম্পর্কে আপন করে নিচ্ছেন, ততক্ষণ ''আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্'' (পৃষ্ঠা ৭৮৩)। একদিকে বিদ্যাশিক্ষার উপায় অনুসন্ধানে, গবেষণায়, কর্মপ্রচেষ্টায় আমাদের যে স্বনির্ভর হতে হবে এ কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ''আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে।'' (আত্মশক্তি) অন্যদিকে দেশের ''সেবাসূত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পন্ডিত-মূর্খ সকলের মিলন'' ঘটিয়ে তোলাকেই (সফলতার সদুপায়, আত্মশক্তি ১৩১১) আমাদের স্বদেশ সাধনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করছিলেন রবীন্দ্রনাথ ।

মানুষের মিলন ঘটিয়ে তোলাই দেশকে জানার সদুপায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ''সদুপায়'' প্রবন্ধটি। কিন্তু এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্ন কোন রাজনৈতিক বা স্বদেশ আলোচনার ধারণা দেয় না; বঙ্গভঙ্গের সমকালীন তাঁর ধারাবাহিক স্বদেশ চিন্তার ভিতর দিয়েই প্রবন্ধটিকে বুঝে নিতে হবে। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মূলগত সমস্যার কেন্দ্রগুলি নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বয়কটের উত্তেজনাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো সমর্থন করেননি, এ কথা আমরা জানি। সব শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বঙ্গভঙ্গের দিনে বয়কটে শামিল হবেন না, সে কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন । এবং বয়কটকে কিছু মানুষের অসমর্থন করার কারণ হিসেবে নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু দেশনায়কদেরই দায়ী করেছেন, ''যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই,... ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।'' কিন্তু এরা সমর্থন করলেই বয়কট একটা মহৎ আন্দোলন হয়ে যেতে পারত, অথবা বয়কটের দ্বারা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব- রচয়িতাদের কোনভাবে বিশেষ প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল,এটা একেবারেই স্বীকার করতেন না রবীন্দ্রনাথ। বরং তাঁর মনে হয়েছিল, হিন্দু- মুসলমানের যে দীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক অনৈক্যের কারণে উপনিবেশবাদীর মনে বঙ্গবিচ্ছেদের কূট চালটির কথা মনে এসেছিল, তার মূলসুদ্ধই উপড়ে ফেলা দরকার।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ওঠা মাত্র ''মুসলমান বাংলা'' আর ''হিন্দু বাংলা'' ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আশঙ্কা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম এই ভাবনা বড় হয়ে উঠেছে যে ব্রিটিশের কৌশলে এই বিভাজন সম্ভব হলে ''বাংলাদেশের মত এমন খন্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।'' (সদুপায়) তবে বাংলাদেশের ভিতরে অনৈক্য যে গোড়া থেকেই আছে, কৌশলী ব্রিটিশ তার সুযোগ নিচ্ছে মাত্র, এই কথাটিও লেখার শুরুতেই স্পষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকলেও এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনদিনই তেমন আন্তরিক মিল ছিল না। উপরন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক ঐক্যের শক্তি আর হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ঐক্যের শক্তিও এক নয়। ''ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি'', আর তাই ''শক্তির প্রধান উপকরণ'' ও তাদেরই হাতে, একথা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। অন্যদিকে, হিন্দু , বিশেষত বাঙালি হিন্দুর মধ্যেও সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় , ফলে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক সীমারেখা টেনে হিন্দু বাঙালি সমাজে অনৈক্য ঘটানো যাবে না, এ বিষয়ে খানিকটা নিশ্চিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ, আবার সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালিরাও পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে। কিন্তু তারপরেও সমস্যা এইখানে যে হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ কোনদিন এক হতে

পারেনি, ''মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে''। পাশাপাশি একই সমাজে দীর্ঘ দিন বাস করার ফলে দুই সম্প্রদায় উভয় উভয়কে খানিকটা সহ্য করেছে, এইমাত্র; কিন্তু ভিতরের মিল হয়নি কখনো। এই যে বিভেদ, যা দুটি সম্প্রদায়ের মাঝখানে আছেই, হয়তো খানিকটা চাপা দেওয়া আছে, ক্ষুরাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেনক্ষু, তাহলে গোটা দেশ জুড়ে সেই বিভেদকে কেন্দ্র করে ঈর্ষা- হিংসার আগুন জ্বলবেই, একথা অনুমান করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন ছিল না।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গোটা বাঙালি জাতির জনবল যে মজবুত হতে পারল না, তার একটা কারণ হলো ওড়িশা- আসাম -বিহার ও বাংলা মিলিয়ে যে অখন্ড বাংলাদেশ তখন, তার মধ্যেও সংযোগের তুলনায় বিয়োজনের নানা সূত্র থেকে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, বাঙালি আর বিহারী কাজের সূত্রে পরস্পরের কাছাকাছি এলেও এদের মধ্যে সদ্ভাব সৌহৃদ্য নেই। উড়িয়া এবং অসমীয়ারাও বাঙালীদের তুলনায় নিজেদের স্বাতন্ত্র প্রমাণ করতে চায়। হয়তো হিন্দুত্ব বা ধর্মের জায়গায় এরা অনেকে এক; কিন্তু ভাষা- সামাজিক আচার ইত্যাদির প্রশ্নে এরা বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে একাত্মতা স্বীকার করে না। বাংলাদেশে বাস করেও উড়িষ্যা- আসাম -বিহার- বাংলা মিলিয়ে একটা অখন্ড বাঙালিয়ানা প্রতিষ্ঠা হয়নি কোনদিন। এক্ষেত্রেও উভয়তই প্রয়াসের অভাব লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ওড়িশা- আসাম- বিহার যেমন নিজেদের বাংলাদেশের অচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেনি, বাঙালিও তেমনি এদের ''নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।'' অতএব, ধর্মগত পরিচয়ে একত্র বসবাস করেও হিন্দু -মুসলমান ভেদে বাঙালি ভিন্ন, আবার জাতিগত পরিচয়ের দিক থেকেও বাঙালি তেমন জনবলে বলীয়ান জাতি নয়। অথচ 'বাঙালি' জাতি তো হিন্দু -বাঙালি আর মুসলমান -বাঙালি মিলিয়েই— ! ধর্ম এদের ভিন্ন, কিন্তু একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে একটি বিশেষ ভাষাভাষী সম্প্রদায় বলেই এরা বাঙালি— অথচ এরা ঐক্যহীন, অতএব দুর্বল । আবার উড়িয়া- অসমীয়া -বিহারীদের মতো বৃহৎ বঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গেও এদের কারোই সহত্ব-সম্পর্ক না থাকায় এরা জনবলে তেমন শক্তিশালী নয়। হিন্দু বাঙালীরা আবার প্রকৃতির দাক্ষিণ্য থেকেও যেন একটু বঞ্চিতই। কারণ, বাংলাদেশের যে বিশেষ অঞ্চল জলবায়ুর আনুকূল্যে ''ফলে শস্যে ঊর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ''; ফলে যে অঞ্চলের বাঙালী স্বাস্থ্যে- প্রাণে উজ্জ্বল, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, ''সেখানে মুসলমান সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।'' মুসলমান ও হিন্দু বাঙালির মধ্যে এই আন্তরিক অসদ্ভাব এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের ইচ্ছাকৃত দূরত্ব,- এইসব মিলিয়ে জাতিগত পরিচয়ের দিক থেকে তারা যখন অনেকটা স্বেচ্ছায় দুর্বল ও হৃতস্বাস্থ্য , তখন ব্রিটিশের পক্ষ থেকে বঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্তে মুসলমান বাংলা ও হিন্দু বাংলা দ্বিখন্ডিত হবে এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ এই যে- ''বাংলাদেশের মতো এমন খন্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।'' কার্জনের এমন পরিকল্পনার কথা অনেকেই বুঝেছিলেন সেদিন।

বাংলাদেশ প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল বিরাট। উত্তর-পূর্বের আসাম থেকে শুরু করে দক্ষিণ পূর্বের আরাকান এবং উত্তর-পশ্চিমের শতদ্রু নদী পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তৃত ছিল। ফলে এত বড় অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজকর্ম সামলানোর সমস্যা ছিলই বাস্তবে।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দেই আসামকে বাংলা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং বাংলাভাষী সিলেট গোয়ালপাড়া এবং কাছাড়কে জুড়ে দেওয়া হয় আসামের সঙ্গে। ১৯ জুলাই ১৯০৫, আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাগের কথা ঘোষণা করা হয়। বাংলা ভাগ হলে সরকারের যে প্রশাসনিক সমস্যা রয়েছে এই বিরাট অংশটির শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে, তার ভার কমবে। আসাম একটি ভিন্ন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রদেশ হয়ে উঠবে, এইরকম একটা পরিকল্পনা হয়তো প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের দিক থেকে ছিল। নতুন এই প্রদেশে লোকসংখ্যা হবে ৩১ মিলিয়ন, হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১৮ ও ১২ মিলিয়ন । অবশিষ্ট বাংলার লোক সংখ্যা হবে ৫৪ মিলিয়ন, যার ৪২ মিলিয়ন হিন্দু ও ৯মিলিয়ন মুসলমান। পুরনো প্রদেশে বাঙালি হিন্দুরা ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু হবে, কারণ প্রচুর হিন্দিভাষী ওড়িয়াভাষী মানুষ থাকবেন এখানে (তথ্যসূত্র-পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, পৃষ্ঠা ৩০২-৩।)

কিন্তু এটাই যে একমাত্র কারণ নয় সেটা স্পষ্ট হতে থাকল, যখন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা হল ভাষার ভিত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে নয়, বরং ধর্মের ভিত্তিতে। কার্জনই ভাষাভিত্তিক বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবকে খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং এর কারণ সম্ভবত এই যে, ভাষাভিত্তিক কারণে বঙ্গবিভাগ হলে বাঙালি -রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আরো সংহত হত। তাদের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় হত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও হত সুসংবদ্ধ। কাজেই বাংলা ভাগের প্রকৃত কারণ আমাদের ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের মধ্যেই খুঁজতে হবে (পলাশী থেকে পার্টিশন, জাতীয়তাবাদের প্রথম পর্যায়, পৃষ্ঠা ৩০২)।

১৯০৫ এর গোড়ার দিক থেকেই কার্জন যখন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেন, তখন থেকেই বাঙালীদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যদিও এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল আরও আগেই। এরপর ১৯০৫ এর ১৭ই জুলাই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ব্রিটিশ পণ্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক দেন। ১৯০৫ এর ৭ আগস্ট কলকাতা টাউনহলে বয়কট প্রস্তাব পাস হয়। এইসঙ্গে বিদেশি দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে স্বদেশী দ্রব্য ও পণ্যের বিকাশ সাধনের প্রয়াস শুরু করা হয়। আন্দোলনের প্রথম দিকে এই গঠনমূলক স্বদেশী ভাবনার একজন মূল প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৩ এর তিন ডিসেম্বরে 'ক্যালকাটা

গেজেটে' কার্জনের এই বঙ্গ বিভাগ বিলটি প্রকাশিত হয়েছিল।বলা হয়েছিল যে', আসাম প্রদেশের সঙ্গে রাজশাহী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে এবং অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং ওড়িশা ছোটনাগপুর- বিহার নিয়ে গঠিত হবে বঙ্গদেশ। (তথ্যঋণ - ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ, নেপাল মজুমদার প্রথম খন্ড)।বাংলাকে ভাগ করে বাঙালি জাতির অখন্ডতা ও তার সম্মিলিত রাজনৈতিক শক্তিকে ভেঙে ফেলাই কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গচ্ছেদের দ্বারা বাঙালি জাতির অখণ্ডতাকে নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির শক্তিকে খর্ব করা যাবে, বাঙালির সম্মিলিত ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া যাবে, এইরকমই পরিকল্পনা করেছিলেন কার্জন। তাছাড়া ক্ষ্মবঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের আধিপত্য সুনিশ্চিত হইবে, এই প্রলোভন দিয়া কার্জন গোপনে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়কে বঙ্গবিভাগের পক্ষে প্ররোচিত করিতে লাগিলেনক্ষ্ম (ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ, নেপাল মজুমদার, প্রথম খন্ড , পৃষ্ঠা ২০২)। কার্জন সহ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী অবশ্য এটা তখনও বোঝেনি যে একদিকে ইউনিভার্সিটি বিল, অন্যদিকে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণার পর বাংলাদেশ জুড়ে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের জোয়ার আসবে।

একদিকে স্বরাজের জন্য স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা আর অন্যদিকে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতায় বয়কট আন্দোলন অবশ্যই দেশীয় সাধারণের বিপুল সমর্থন পেতে থাকল। কিন্তু এই সময়ই বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিল। এই সংঘর্ষ তৈরি হতে মদত যুগিয়েছিল ইংরেজরাই। এদিকে বয়কট-আন্দোলনকে সামনে রেখে দরিদ্র মুসলমান প্রজাকে বিদেশী সস্তা ও উন্নতমানের পণ্য কিনতে বাধা দিয়ে দেশীয় অনুন্নত বা অতি সাধারণমানের পণ্য কিনতে বাধ্য করছে স্বদেশীরা, এমনই ধারণা তৈরি হল তাদের মনে। সে ধারণা অনেকাংশে সত্যও বটে।

শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র্যা পার ইত্যাদি সব সরিয়ে নিতে হবে, ''স্বদেশীর বান'' যেদিন প্রবল হয়ে উঠল, স্থানীয় ছেলেরা সন্দীপের কাছে স্বদেশীয়ানার পাঠ নিয়ে, এই দাবি জানিয়েছিল নিখিলেশের কাছে। বিলিতি পণ্য বয়কটে মত ছিল না নিখিলেশের। নিজের লোকসানের সম্ভাবনায় বয়কটে গররাজি নিখিলেশ,- একথা বলে স্বদেশী তরুণেরা অপমানও করেছিল ''ঘরে বাইরে''র নিখিলেশকে। তাদের বয়কট দেশের কথা ভেবে, ব্যক্তির লোকসান নিয়ে ভাবে না স্বদেশী আন্দোলন; অনেকটা এরকমই যখন বোঝাতে চেয়েছিল তরুণেরা, তখন চন্দ্রনাথ সেই তরুণদের প্রশ্ন করেছিলেন যে দেশের 'মানুষ' যারা, শিক্ষিত ভদ্র জন তাদের 'একবার চোখের কোণেও' তাকিয়ে দেখেনি কোনদিন। অতএব এখন নিতান্ত স্বদেশীয়ানার নেশার ঘোরে এই পথের ধুলোয় পড়ে থাকা মানুষগুলো ''কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে'', তা নিয়ে জুলুম করাটা এদের প্রতি অত্যাচারই হয়ে দাঁড়াবে। জুলুম তবু হয়েছিল পঞ্চুর প্রতি। মাস্টারমশাইয়ের ঋণ দেওয়া টাকায় ধুতি শাড়ি ইত্যাদি কিনে চাষীদের ঘরে ঘরে বেচে আয়ের একটা পথ করেছিল পঞ্চু। কিন্তু সে কাপড় বিলিতি বলে, সেই অপরাধে বয়কটের জিগিরে পঞ্চুর এলাকার জমিদার হরিশ কুন্ডু পঞ্চুকে একশ টাকা জরিমানা করেছে। একশ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা পঞ্চুর নেই, তাই পুড়িয়ে ফেলা হলো সেইসব বিলিতি-পোষাক। কিন্তু পঞ্চুর মত গরিব প্রজাদের বিলিতি- পণ্য বিপণনে বাধা দেওয়া গেলেও, সন্দীপ দেখল, ''মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না''। সস্তা দামের দেশি গরম জামার সংস্থান করতে পারল না বয়কটপন্থীরা, কিন্তু বিলিতি জামা পুড়িয়ে দিল। হাটে বিলিতি-পণ্য নিয়ে -আসা নৌকোর মালিকদের 'ছলে-বলে' বাধা দেওয়া গেলেও, যাকে সহজে বশ করা যায়নি, তাকে উপন্যাসে মিরজান নামে পেয়েছি আমরা। শেষ পর্যন্ত মিরজানের নৌকোই ডুবিয়ে দিয়েছিল সন্দীপের দল। মিরজানকে টাকা দিয়ে হাত করলে আখেরে লাভ, এ কথা ভেবেও দ্রুতই সন্দীপের মনে হয়েছিল, ''গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না, ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক নাচ নাচাব।'' নিখিলেশের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হলেও, ইন্সপেক্টর প্রথম যাকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে, তার নাম কাসেম। ইন্সপেক্টর যে কাসেমকে সন্দেহ করে, তার কারণ সন্দীপের ওই ভাবনার মধ্যেই আছে- ''ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে''। আর নিখিলেশ যে কাসেমকে সন্দেহ করে না, তার মূল আছে তার এই বিশ্বাসের মধ্যে ''ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয়, তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।''

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্বে মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশের কৌশলী রাজনীতি মুসলিমদের জন্য ভিন্ন প্রভিন্সে চাকরির বিশেষ সুবিধে করে দেবে, অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে মুসলমান সমাজ, এরকম প্রলোভন দেখানো হয়েছিল তাদের। সুরঞ্জন দাস তাঁর "Communal Riots in Bengal" বইতে এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন " Initially the agitation (Swadeshi movement) involved a significant and sincere Muslim participation– but successful British propaganda to the effect that the new province with a muslim majority would provide more jobs and opportunities for the Muslims-detached a large section of the upper middle class groups of that community from the movement" (Communal Riots in Bengal,Oxford,1991, page-40)। মুসলিম সমাজকে হিন্দু সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশরা এতটাই কূটনৈতিক চালের আশ্রয় নিয়েছিল যে, ১৯০৬এ ময়মনসিংহে যে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শুরু হল, শাসকগোষ্ঠী তাদের অফিসিয়াল রিপোর্টে তার সম্পূর্ণ দায় চাপাল বয়কট আন্দোলনের নেতাদের

উপরেই। সেই সময়ের ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, "...pressure by Hindu Landlords to boycott foreign goods was (first among the causes) of the Riot" (ঐ', পৃষ্ঠা ৪১)। তবে এর মধ্যে যে সত্যতা ছিল সেটা বোঝা যায়, 'সদুপায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট মত প্রকাশে- ''আমরা ধৈর্য হারাইয়া সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচার মাত্র না করিয়া বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার- সাধনের কাছে আর কোন ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।"

আমাদের মনে পড়ে যে, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই একই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতি বয়কটপন্থীদের জুলুমের প্রতিবাদ করেছেন মাস্টারমশাই- ''তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ, সেটা কেবল জোরের উপর।" বাজার থেকে বিদেশি জিনিস তুলে নেওয়া নিয়ে যখন মতের সংঘাত হল তরুণ দেশসেবকদের সঙ্গে নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথের, তখন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শাসানি দিয়ে চলে গিয়েছিল মাত্র। নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিবাদের সামনে সেই মুহূর্তে কিছু করতে পারেনি তারা কিন্তু সস্তায় বিদেশি কাপড় বিক্রি করে গরিব পঞ্চু যে সামান্য দু-পয়সা রোজগার করতে শুরু করেছিল, জমিদার হরিশ কুন্ডু তাতে তাকে একশ টাকা জরিমানা করে ও তার বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দিয়ে তার রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয় আর মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয় এমন যে, নিখিলেশ যখন তাকে নিজের জমিদারির আওতায় এনে বিদেশি কাপড় বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবে বলে, পঞ্চু তাতে কোনমতে রাজি হয় না। তার ভয় ''মরবার বেলায় আমি মরব... ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে সুদ্ধ নিয়ে পুড়ব।" যে গরিব প্রজাদের নিয়ে ভদ্র ও উচ্চ কোটির মানুষের কোনকালেই মাথাব্যথা ছিল না, বঙ্গভঙ্গের সময়ে স্বদেশিয়ানার আবেগ জাগিয়ে তুলে সেই দরিদ্র প্রজাদের রুটিরুজির উপর আঘাত করলে তারা যে সহজে সেটা মেনে নেবে না এবং তাদের মনে বিরূপতা তৈরি হবেই, এটাই স্বাভাবিক। জমিদার ও স্বদেশী প্রচারকেরা বিলিতি বয়কটের দিনে যে মানসিকতা নিয়ে সাধারণ গরিব মানুষের বিলিতি জিনিস বেচাকেনায় নিষেধ জারি করেছিল, তাতে স্পর্ধা এবং জুলুমের ভাগই বেশি ছিল। অতএব ''কখনো যাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না" (সদুপায়)। এর ফলেই ময়মনসিংহে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু স্বদেশীদের ধারণার সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, 'সদুপায়' প্রবন্ধে সেটা খুব কোমল করেই জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ (...''আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই"... ইত্যাদি), কিন্তু বাস্তবে আমরা সবাই জানি যে স্বদেশী প্রচারকদের জুলুমে সেদিন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-ই সৃষ্টি হয়েছিল

"...the Mymensingh disterbances of 1906-07- proparly began on 21 April at a mela SfairV in Jamalpur when Hindu Swadeshi Volunteers attacked Muslim shops selling belati (foreign) products. This invited instant re-taliation from Muslim shopkeepers, who struck back at the volunteers with bamboos snatched from their stalls. A riot then developed....(Communal Riots in Bengal 1905-1947, Suranjan Das, University of Oxford, 1993– pg. 38)।

একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার একথা বলেছেন যে, আমাদের দেশের ভদ্রজন বরাবরই দরিদ্র শূদ্র এবং মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করেছেন; সমাজের প্রান্তিকজন হিসেবে সেই অবজ্ঞা এরা ভোগ করেছেন; অতএব সাময়িক একটা প্রয়োজনে হিন্দু স্বদেশীদের সাদর আহ্বান অথবা জুলুম, এর কোনটাই তাদের মেনে নেওয়ার কথা ছিল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ এই সাধারণদেরই বলেছেন, 'দেশের লোক', আর দেশের লোকের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা স্বদেশীরা তাঁর ভাষায় ''আমরা"। ''আমরা" যারা , তারা সমাজের মেন্- স্ট্রিম বা পাওয়ার পজিশনে থাকা মানুষ। এই উন্নত-অভিমানী মানুষেরা যখন ইংরেজ তাড়ানোর অভিপ্রায় নিয়ে সাধারণের মতকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তাদের কাছে গেছে, তখনও ''দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসা বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে।" আর ভদ্রজন সমাজে সাধারণকে কখনোই ভালোবাসেনি বলেই দেশকে 'মা' বলে যখন আবেগে ভেসে গেল তারা, দেশের জনসাধারণ কিন্তু তখন তাদের সেই আবেগে সাড়া দিল না। রবীন্দ্রনাথ এটাই বলতে চান যে, দেশকে সত্যিই 'মা' বলে জানলে দেশের সব সাধারণের সঙ্গে নিজের যে রক্ত সম্পর্ক স্বীকার করতে হতো, উচ্চকোটির হিন্দু ও স্বদেশী-আন্দোলনকারীরা মুখে বললেও হৃদয়ে তা অনুভব করেনি। 'দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই'। তাই স্বদেশ সংগীতে, 'ভাবোন্মাদে'

দেশকে 'মা' বলে যতই স্বর সপ্তমে তোলা হোক, সেই আবেগটা জনসাধারণের কাছে সত্যি বলে মনে হয় নি। এর ফাঁকিটা তারা ঠিকই বুঝেছে। যে স্বদেশে তাদের অবস্থান সর্বদা কুণ্ঠিত অবমানিত, সেই স্বদেশকে 'মা' বলে মানতে গেলে বহু অভিমান অভিযোগ তাদের মনে তৈরি হওয়ারই কথা। স্বভাবতই ইংরেজিপড়া বাবুদের স্বদেশিয়ানার মন্ত্রে গলা মেলাতে পারেনি সাধারণেরা যখন, তখন আবার স্বদেশী নেতার দল আরো বড় ভুল করে বসেছে—''আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বল- প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে।" বলপূর্বক সাধারণ মানুষের হিতসাধনের এই জেদ যেমন স্বদেশীদের সঙ্গে সাধারণের আরো বিভেদ তৈরি করে দিল, তেমনি এর ফলেই ইংরেজদের শোষণনীতিও ইন্ধন পেল। ব্রিটিশকে

রাজনৈতিকভাবে জব্দ করতে গিয়ে, দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের সঙ্গেই বিরোধ ও ব্যবধান তৈরি করে ফেলেছিলেন দেশীয় বয়কট পন্থীরা। আন্দোলনের এই স্বেচ্ছাচারে কোনোভাবেই সমর্থন জানাননি রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ''দেশনায়ক'' প্রবন্ধটিতেও স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি - ''আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালির মুখে 'বয়কট' শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি।.. বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।'' (মূল প্রবন্ধে বর্জিত, গ্রন্থপরিচয়, পঞ্চম খন্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৮২৪)। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বয়কটের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই একটা দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন। ''দেশনায়ক'' প্রবন্ধে বর্জিত কিন্তু বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে সংযুক্ত ''দেশনায়ক'' প্রবন্ধটির পত্রিকাপাঠের একটি জায়গায় লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বয়কট আন্দোলনের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন , বিদেশি বস্ত্র বর্জন করে যখনই দেশি কাপড় চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হল ঘটা করে, ঠিক তখনই দেশি কাপড় খোলা বাজারে বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়ল। কারণ ''দেশী কাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, একথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল আখড়ায় টানিয়া আনিতে হয়— ইংরেজ তখন এই উদযোগকে কেবল যে নিজের দেশের তাঁতির লোকসান বলিয়া দেখে তাহা নয়, এই হারজিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে নিজের দুর্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছাপূর্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই।'' (গ্রন্থপরিচয়', দেশনায়ক প্রবন্ধের পত্রিকাপাঠ রচনাবলী বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৯৪ ,পঞ্চম খন্ড', পৃষ্ঠা ৮২৫)।

বিলিতি জিনিসে তৈরি নিজের সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল একদিন ''ঘরে বাইরে''র বিমলা। নিখিলেশ সেদিন তাকে বুঝিয়েছিল, ''গড়ে তোলবার কাজে'' সর্বশক্তি নিয়োগ করলে ভেঙে ফেলার উত্তেজনা তুচ্ছ বাজে খরচ মনে হবে। একদিন বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু কোন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এই বিলাতি-বর্জনে তাঁর মত ছিল না। ''আত্মশক্তি'' গ্রন্থের অন্তর্গত ''অবস্থা ও ব্যবস্থা'' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বয়কট সমর্থন করেননি, বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশি ব্যবসায়ীদের লাভের পথ খুলে দেওয়াও তাঁর বয়কট সমর্থনের উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি মনে করছেন, বিলাতি-পণ্য ব্যবহার না করার ফলে যদি জনসাধারণের মনোভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হয়ে একদিন স্বেচ্ছায় 'সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত' হয়, ''যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে'' যদি সত্যিই দেশের মানুষ কষ্ট অনুভব করে এবং দেশি জিনিস ব্যবহারের ফলে 'আরাম ও আড়ম্বর' থেকে খানিকটা বঞ্চিত হওয়ার দুর্ভোগকে সাদরে মেনে নেয়, তাহলে সেই 'ত্যাগের দ্বারা' মানুষ দেশকে একদিন আপন করে নিতে শিখবে। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে বয়কট বা বিলাতি পণ্য বর্জন একটি স্থায়ী মঙ্গল ভাবের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বয়কটপন্থী স্বদেশী নেতারা যখন বঙ্গবিচ্ছেদের বিপদ শিয়রে জেনে হিন্দু -মুসলমান-শূদ্র -ব্রাহ্মণ -ধনী নির্ধন সকলকেই বয়কট প্রস্তাব সমর্থন করার ডাক দিল তখনও সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ এ কথাই ভেবেছিলেন যে সাময়িক উত্তেজনায় পাওয়া এই ঐক্যকে চিরকালীন মূল্যে গ্রহণ না করতে পারলে অনেক দুঃখে পাওয়া এই ঐক্যবোধ নিরর্থক হয়ে যাবে। 'আমরা হিন্দু মুসলমান, ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি- আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায়, তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই।' (অবস্থা ও ব্যবস্থা, আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী ৫, বিশ্বভারতী, সুলভ ,১৩৯৩, পৃষ্ঠা ৬৭৮)।

কিন্তু স্বদেশীদের নেতৃত্বে বয়কট যে এমন চিরস্থায়ী কোন মঙ্গল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি, একথা বুঝতে দেরি হলো না রবীন্দ্রনাথের। তিনি লক্ষ করলেন যে , বিভেদ থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য বয়কট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও এবং বাইরে থেকে ঐক্যের কথা বললেও আসলে এমন এক ভেদ বা অনৈক্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে, যার ক্ষত দরিদ্র নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে দেশ সম্পর্কে কোন স্থায়ী ঐক্যবোধ এনে দেবে না, বরং বিভেদ -সন্ত্রাসের শিকার হয়ে গভীরতর ক্ষত তাদের মনে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। গরিব নমঃশূদ্র এবং মুসলমানদের কাছে স্বদেশী হিন্দুরা ভদ্রজন আর এই ভদ্রদের কাছে তারা বরাবর পরিত্যক্ত অসম্মানিত । এই দীর্ঘকালের সামাজিক অসম্মান সহ্য করে তথাকথিত ভদ্রজনদের এরা কোনদিনই বিশ্বাসযোগ্য মনে করে নি। তাই তাদের রাজনৈতিক জবরদস্তিও এরা মানল না।

দেশি পণ্য বাজারে বিক্রির জন্য জুলুম শুরু হলে তরুণ শিক্ষিত স্বদেশীদের সঙ্গে দরিদ্র নমঃশূদ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মনের অমিল বাড়তেই থাকল। দরিদ্র রায়ত বা ভাগচাষীদের উপর, হাটে বিলিতি পণ্য নিয়ে বসা গরিব হাটুরেদের উপর, হিন্দু জমিদার ও তার কর্মচারীদের উপর জোরজুলুম বিবাদ -সংঘর্ষ বেড়েই চলে। প্রজাবিদ্বেষী জমিদারও হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে স্বদেশী প্রচারক হয়ে উঠলে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে ঘোলা জল এসে মেশে। ক্ষ্মঘরে বাইরেক্ষ্মর হরিশ কুন্ডুর কথা এ- প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। ক্ষ্মসদুপায়ক্ষ্ম প্রবন্ধেও নিজের গোচরে আসা এমন ঘটনার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ- মফস্বলের কোন একটি বড় বাজারে উৎসাহী স্বদেশীরা এই নোটিশ পাঠিয়ে হুমকি দিয়েছে যে বিক্রেতারা বিলিতি জিনিস ফেলে দিয়ে বাজারে দেশি জিনিসের আমদানি না করলে 'বাজারে আগুন লাগিবে',এমনকি স্থানীয় জমিদারেরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে তাদের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে থাকা এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধতা করলেন রবীন্দ্রনাথ- ক্ষ্মদুঃখের

বিষয় এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না"। কোনরকম অন্যায়ের সহায়তা নিয়েই যে দেশের মঙ্গল করা যায়, এ কথা কোনভাবেই বিশ্বাস করতেন না রবীন্দ্রনাথ। বয়কটের জুলুম করে কাউকে ভিতর থেকে স্বদেশপ্রেমী করে তোলা যায় বলেও তিনি মনে করেননি। বরং তাঁর মতে, এতে দেশের বা সমাজের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদেরই সূচনা হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা চেয়ে অন্যকে সামাজিক ক্ষেত্রে পরাধীন করে রেখে দেশহিতৈষী ভদ্র-জনেরা 'নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত' খাটিয়ে চলেছেন, সেই ঔদ্ধত্য ও অশ্রদ্ধাকে কোনভাবে মানতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। অন্যের হিতসাধনের ছলে প্রকারান্তরে তাকে অশ্রদ্ধা করা, তার প্রতি জোর খাটানোর এই স্বভাব আসলে মনুষ্যত্বের অবমাননা ডেকে আনে এবং তা উভয়তই। অর্থাৎ দেশহিতৈষীর অন্যায় জুলুম মেনে নিতে বাধ্য হলে দরিদ্র সাধারণের মনুষ্যত্ব অবমানিত হয়। আবার যেখানে হৃদয় প্রসারিত করে সাধারণের সহায়তা চাওয়ার কথা, অন্যের স্বাধীনতা খর্ব না করে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার কথা, সেখানে অন্যের উপর নিজের মত চাপানোর অন্যায় উপদ্রব করে দেশ সেবকেরা নিজেদের মনুষ্যত্বের ও অবমাননা করছেন এমনই মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু মনুষ্যত্বের এই নিত্য অবমাননা যাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে চলেছিল তারাই সেদিন দেশ সেবক হয়ে ওঠার খ্যাতি এবং কীর্তি লাভ করেছে। হরিশ কুন্ডুরা খ্যাতি প্রশংসার জয়মাল্য পেয়েই চলেছিল তাই। তবে নিখিলেশ কিন্তু তখনো এ কথা বলতে দ্বিধা করেনি, ''মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয়, তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হলো মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা। আর সাধারণ মানুষ মর্মে এই মার নিয়ে কখনোই দেশহিতের কোন রকম জিগিরে কান দেবে না, এটা নিশ্চিত। অতএব রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ না করে দেশহিতৈষীকে আগে 'মানুষের সাধনা করিতে হইবে"। যখন অহংশূন্য আমিত্ব বর্জিত দেশহিতৈষী মানুষের মঙ্গল সাধনকেই তার একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করবে, জানবে যে 'আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি' তখনই মানুষ এবং দেশ দুই-ই তার কাছে সত্য হয়ে উঠবে। আর সাধারণের মনুষ্যত্বকে একবার সম্মান করতে শিখলেই উচ্চ- নিচ- জাতি- ধর্ম ভেদহীন মানবতা ও দেশবোধকে ঐক্যসূত্রে লাভ করা যাবে। নতুবা ''মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না।" শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে, যদি দেশহিতের সাময়িক উত্তেজনার মদে উন্মত্ত দেশহিতৈষী দেশহিতের নামে দুর্বলের প্রতি অন্যায় করেই চলে এবং দেশহিতের তুলসী পাতায় অন্যায়কে ধুয়ে তাকেই ন্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে চলে, তবে সেই অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা একদিন যথার্থ দেশ সাধনার সব পথ রুদ্ধ করে দেবে। ক্রমে দেশহিতৈষীর স্পর্ধা সব অর্থই অত্যাচারীর বজ্র-মুষ্টি হয়ে দাঁড়াবে, যার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার পথ খোঁজা ছাড়া অন্য আর কোন উপায় থাকবে না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের নামে ঘটে চলা নানা সন্ত্রাস বিষয়ে তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি বুঝেছিলেন, স্থানীয় জমিদার এবং তরুণ স্বদেশীরা বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি, দরিদ্র সাধারণের প্রতি তাদের সন্ত্রাসের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। খ্রিস্টান পাদ্রির পিঠে গুলিবর্ষণ, ট্রাম গাড়ির উপর আক্রমণ ইত্যাদি ধারাবাহিক ঘটনাগুলি দেশপ্রেমিকদের হিংসাশ্রয়ী এমন উন্মত্ততাকে চিহ্নিত করে,যে সেইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা দেশের হিতের পরিবর্তে 'মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়'। এতে তথাকথিত দেশহিতৈষীদের তাৎক্ষণিক খ্যাতি পরিচিতি তৈরি হতে পারে, কিন্তু দেশহিতের সেই অসংযত স্পর্ধাশীল ভাবাবেগ দেশহিতৈষীদের যথার্থ শক্তি কোথায়, এসম্পর্কে তাদের নিজেদেরই অন্ধকারে রাখে। এইখানেই তরুণ দেশপ্রেমিকদের সহনশীল হতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। এই সৃজনের পথ তাঁর মতে মিলনের পথ: আর সেই মিলনের পথেই ধর্মের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়। রবীন্দ্রনাথের দেশচেতনা শেষ পর্যন্ত মানবমিলন সহিষ্ণুতা ও ধর্মের পথেই এসে দাঁড়ায়। সেই ধর্মের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন সদুপায় প্রবন্ধেও ''...মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে।"....

''...ধর্মের পথ দুর্গম—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন....।" এই পথেই মানুষকে জানার সাধনার ভিতর দিয়ে দেশকে অর্জন করার 'সদুপায়' প্রকাশ পাবে।

এক প্রহেলিকার নাম কমলা দাস: বাংলার মহিলা কবিও কি একই ধারার বাহক ?

নীলাঞ্জনা সেন, ইংরেজি বিভাগ

" I too call myself I" (আমিও নিজেকে আমি বলি)- বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ্যে যে কণ্ঠস্বরটি নিজস্ব identity বা সত্তার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট উচ্চারণে ঘোষণা করেছিল অথচ তাকে রেখেছিল অবিশিষ্ট বা uncategorized, তিনিই কবি কমলা দাস। কমলা সুরাইয়া দাস একজন ইঙ্গভারতীয় কবি। তিনি তাঁর সমগ্রজীবন এই ভারতবর্ষে অতিবাহিত করলেও তার কবি সত্তার প্রকাশের মাধ্যম ইংরাজি। একজন post colonial তথা উত্তর ঔপনিবেশীক কবি, একজন মহিলা / নারীবাদী লেখক, একজন কনফেশনাল কবি – কাব্য সাহিত্যের এমন বহু শাখার আলোচনায় তাঁর নাম বারবার উল্লেখিত হলেও , তাঁর জোড়ালো স্বাতন্ত্র্য বাধা পড়েনি কোন একটি বিশেষ বিভাগে। তাঁর জীবনের ছায়া পড়েছে তাঁর কবিতায় আর মার্কিন কবি সিল্‌ভিয়া প্লাথের মতন তাঁর পাঠকেরাও দুলতে থেকেছে এক চিরন্তন দোদুল্যমানতায়: তাঁর বইয়ের পাতার মতোই তাঁর জীবনও কি এক খোলা ডাইরি না তিনি ও তাঁর সৃষ্ট এক জীবন্ত প্রহেলিকা। ।

একজন literary icon অথবা ট্যাবলয়েড প্রেস যেভাবে তাকে উপস্থাপনা করে – "Love queen of Malabar "- , অথবা তাঁর The Times তাকে নামাঙ্কিত করে " the mother of modern English Indian poetry " হিসেবে , কমলা দাস তাঁর সমগ্রজীবন ছিলেন বিতর্কের বৃত্তের কেন্দ্র স্থলে। জন্ম ১৯৩৪ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের মালাবার জেলার পূর্ণায়কুলামে, পনেরো বছর বয়সে অঙ্কে ফেল করার অপরাধে বন্ধ পড়াশোনা ও পঁয়তিরিশ বছর বয়সি ব্যাঙ্ক কর্মী মাধব দাসের সঙ্গে বিবাহ। কুড়ি বছর পেরোনোর আগেই দুই সন্তানের জননী। কিন্তু সামাজিক পরিমণ্ডল দ্বারা নির্দিষ্ট ভূমিকা অস্বীকার করলেন এই প্রতিভাশালী বিদ্রোহিনী। মা বালামনি আম্মা মালয়ালি সাহিত্যের এক প্রোথিত যশা কবি, বাবা "মাতৃভূমি " র মতো জনপ্রিয় সংবাদপত্রের সংপাদক আর তার দাদু বিখ্যাত লেখক ও বহু ভাষা ও বিষয়ে পন্ডিত। এই উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক পরিবেশ , নায়ার গোষ্ঠী বংশানুক্রমিক অভিজাত ও নালাপত্তের সমৃদ্ধ পারম্পরিক জ্ঞান ও বহু মাত্রিক জীবন চর্জা মিলিত হল কবির অনন্ত জিজ্ঞাসা অপরীসিম সংবেদনশীলতা ও কল্পনার সঙ্গে। একের পর এক প্রকাশিত হল " Summer In Calcutta", "The Descendants" , "The Old Playhouse And Other Poems" ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ, “My Story” নামক আত্ম অনুসন্ধানমূলক রচনা, অসংখ্য মালায়ালী ছোট গল্প ও তার একাংশের ইংরেজি অনুবাদ "A Doll for the Child Prostitute" , "Padmavati the Harlot " ইত্যাদি , উপন্যাস "Alphabet of Lust " অজস্র ইংরেজি ও মালায়ালী সংবাদ পত্র প্রতিবেদন, এমনকি স্বরচিত প্রার্থনা গ্রন্থ। প্রায় ষাট বছর বয়সে পেশাদারি ভাবে চিত্র শিল্পে মনোনিবেশ করলেন কমলা দাস, উপহার দিলেন "The Incomplete Woman " সিরিসের চিত্রগুলি। ১৯৯৯ সালে প্রায় পঁয়ষটি বছর বয়সে তাঁর ইসলাম ধর্মে রূপান্তর চূড়ান্ত বিতর্কের জন্ম দিল। ইংরাজি কবিতার লেখক কমলা দাস মালায়ালী গল্পের হয়ে যান মাধবি কুট্টি, amy নামটিও তাঁরি আবার ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তিনি গ্রহণ করলেন সুরাইয়া নামটি। কমলা দাস জার্মানি , সিঙ্গাপুর, লন্ডন, কানাডা ও উপসাগরীয় দেশ গুলিতে বারবার আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ফরাসি, স্প্যানিশ, রুশ, জার্মান, জাপানি ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পুরস্কারের ঝাঁপিতে রয়েছে Pan Asian Poetry Award, কেরল সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার, জাতীয় সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার, এমনকি ১৯৮৪ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হওয়ার গৌরব। বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি চূড়ান্ত অপমান ও অপবাদ, এমনকি জীবন নাশের হুমকি, যা ২০০৯ সালে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো, তা কবিকে যে তারকোচিত সম্মান, উন্মুক্ত ভালোবাসা ও ঘৃণা এবং চরম বিড়ম্বনা দিয়েছিলো, তা সাহিত্যজীবীদের জীবনে সচারচর ঘটেনা।

ভারতবর্ষ কেবলমাত্র এক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের পুণ্যভূমি, এই প্রাচ্যবাদী বা " Orientalist " ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যে কয়েকজন ইঙ্গ ভারতীয় কবি একটি post colonial বা উত্তর – ঔপনিবেশিক সাহিত্যিক বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন, কমলা দাস ছিলেন তাদের পুরোভাগে। প্রাচীন ভারতের গৌরব গাঁথা বা বর্তমান ভারতের নান্দনিক ও দার্শনিক উৎকর্সসূচক বিষয়ের বদলে তিনি কবিতার বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন বাল্য বিবাহ, নারীর যৌনতা, নারীর বয়োপ্রাপ্তি, প্রেম, যৌন আঁকাঙ্খা, সমকামী প্রেম, শারীরিক আকর্ষণ, ব্যক্তিগত জীবনচর্যা ও অনুভূতি ইত্যাদি। বহু সাহিত্যসমালোচক তাঁর কবিতায় উন্নবিংশশতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতকের মার্কিন কনফেশনাল কবিদের, বিশেষত মহিলা কবিদের ছায়া দেখতে পান। বিভিন্ন সমকালীন সামাজিক বিষয় তাঁর কবিতাকে বহুমাত্রিক করেছে, তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর কবিতার মূল রেফারেন্স পয়েন্ট তিনি নিজেই। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও আবেগ কে aestheticize

করে তিনি তৈরী করেছেন তাঁর poetics, আর তা তাঁকে বারবার সমাজের মূলস্রোত থেকে ছিটকে ফেলে দিয়েছে অনৈতিক অশালীনতার প্রান্তদেশে।

বহু আলোচিত বরং বহু সমালোচিত এই লেখক বহু চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করেছেন এক নিরবিচ্ছিন্ন সততার সঙ্গে, মূল্য কম দিতে হয়নি তাকে। সরাসরি সাহিত্যচর্চায় বাধাঁ না দিলেও মাধব দাস এটুকু নিশ্চিত করেছিলেন যে তার স্ত্রী একজন গৃহিণীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করে ও তার ব্যক্তিগত চাহিদার সবটুকু পূরণ করার পরেই কলম ধরতে পারবেন। ফলে রান্না ও অন্যান্য গৃহস্থলি কাজের মাঝেই, বা তার স্বামীর যৌন খুদা নিবৃত্তির পর গভীর রাতে চলতো তাঁর লেখালেখি। অবশ্য তাঁর লেখনীর অর্থমূল্য জানার পর কমলা দাসকে তার স্বামীর নির্দেশে পরিবারের আর্থিক স্বছলতা বৃদ্ধির জন্য সংবাদপত্রের column ও এই ধরণের লেখা চালিয়ে যেতে হয়। এমনকি কবিতার চেয়ে গদ্যসাহিত্য বেশি অর্থকরী বলে প্রমাণিত হওয়ায়, কবির উপর তা লেখার জন্যে চাপ আস্তে থাকে। তাঁর my story সনাতনী প্রতিক্রিয়াশীল কেরালা পরিবারে একজন বিবাহিত নারীর অবস্থানের এক অনাবৃত নথি। কবির মাও মালয়ালি ভাষার একজন খ্যাতনামা কবি ও বিভিন্ন ভারতীয় ক্লাসিক -এ সুপন্ডিত ছিলেন। কমলার ভাষায় তিনি ছিলেন মাতৃত্বের কবি "poetess of motherhood", বা যেমনটি বলেছিলেন তাঁর বন্ধু ও জীবনীকার Merrily Wisboardকে, দক্ষিণী সাহিত্যে "last word of respectablity " - আভিজাত্যের শেষ কথা। আসলে মহিলা কবিদের তিনি সাহিত্যের যে tradition পেয়েছিলেন, তার মূল উপজীব্য ছিল ঈশ্বর, সন্তান ও গৃহাভ্যন্তর। তাঁর মাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কমলাও হাতে তুলে নেন কলম, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন তাঁর মা, ঠাকুরমা,মাসি, দিদা, যারা নিঃশব্দে সব যন্ত্রনা সহ্য করেছিলেন, এই মহত্ব তাদের কোনো রক্ষাকবচ দিতে পারেনি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন তাঁর লেখা হবে স্পষ্ট ও সৎ : " all the pain unexpressed and the sad stories left untold made me write recklessly and in protest" । তাই তিনি এ কথা লুকোনোর তাগিদ অনুভব করেননি যে তিনি স্বামীর অনুরোধে তাঁর ৩০ বছর বয়সে তাঁর দ্বিগুন বয়সের উর্দ্ধতনের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হন। তবে মাধব দাসের এই উর্ধতনের সঙ্গে কমলার এক গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে: তাঁর পান্ডিত্য কমালকে সমৃদ্ধ করে, তাঁর কমলতা তাকে ঋদ্ধ করে, কমলা তাঁর মধ্যে খুঁজে পান তাঁর হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তাবোধ যা ছোট্ট কমলা পেত তাঁর ঠাকুরমার কাছে।একইভাবে তাঁকে খুশি করতে হয়ে এক মন্ত্রীকে কর্মস্থলে তাঁর স্বামীর উন্নতি নিশ্চিত করতে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "Summer in Calcutta " যদি তাঁর প্রথম "love adventure "-এর ফসল হয়, তাঁর কবিতার সিংহ ছিলেন পরবর্তী জন।

এ ঘটনা নতুন নয়, কিন্তু এ ঘটনার বিবরণ, তাও সাহিত্য, তদোপরি কবিতায় - চমকে উঠলো পাঠক সমাজ। নিন্দেমন্দ কম হলোনা, আবার কবির অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্খা রসালো পণ্য হওয়ায় অনেকের অর্থউপার্জনের পথ সুগম হলো। কিন্তু থামানো গেলোনা কমলা দাসকে। তিনি তাঁর "an introduction " কবিতায় কয়েকটি আঁচড়ে খুলে দিলেন পবিত্র বিবাহবন্ধনে স্বরূপ: একটি ১৫ বছরের মেয়ে প্রথম রাতেই তাঁর স্বামীর কাছে ধর্ষিত হলো। তাঁর স্বামীর যৌন নির্যাতনে তীব্র যন্ত্রনা ও রক্তপাত,অপ্রস্তুত মাতৃত্ব, সার্ভিক্যাল অপারেশন, স্বামীর সমকামী সহবাস, স্বামীর ভয়ারিস্টিক আনন্দবিধানের জন্য একজন স্ত্রীর ক্রমাগত কোলপিত ও বাস্তব বিবাহবহির্ভূত যৌন জীবনের বর্ণনাদান সবই উঠে এলো কবিতায়, আত্মজীবনীতে ও জীবনীকারদের কাছে তাঁর একান্ত স্মৃতিচারণায়। যৌনতা বিষয়ে তাঁর খোলাখুলি মন্তব্য ও বিতর্কিত অবস্থান তাঁকে অতি সহজেই সহজলভ্য object – “of desire "- এ পর্যবশিত করেছে। বহু ফ্যান, পরিচিত এমনকি আত্মীয়স্বজন ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ চেয়েছে আর প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় হয়ে ওঠেছে তাঁর কঠোরতম সমালোচক। এই অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ভাবেই কবি তাঁর জীবনীকার বন্ধুকে বলতে পারেন " i hate sex ".

কিন্তু এই গতানুগতিক ছকে কখনোই বাঁধা পড়তে পারেন না এই iconic cult figure. তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেন " for me , sex means something beautiful, something sacred" [৪]. কৃষ্ণ, যাকে তিনি কিশোরীবেলা থেকে ভালোবেসেছেন খেলার সাথী হিসেবে, আরাধনা করেছেন প্রেমিক রূপে, যাকে স্মরণ করে গিতগোবিন্দের গানের তালে নেচেছেন মগ্ন হয়ে , সেই কৃষ্ণা যে প্রেমের সূচক তাকে তিনি অপবিত্র বলবেন কি করে ? তাই তিনি সগর্ব উচ্চারনের ব্রাহ্মণ প্রেমিক, সিংহ-রুপি দামাল প্রেমিক, ইতালিও সঙ্গী ও অন্যান্য যৌন্য সম্পর্কের কথা লিপিবদ্ধ করেন। অজস্র অপবাদ ও স্ক্যান্ডালের মধ্যমনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়েন ইসলামে ধর্মান্তরীত হয়ে। তিনি অসংকোচে স্বীকার করেন তাঁর এই ধর্মান্তরের কারণ তাঁর তীব্র প্রণয়াকাঙক্ষা। তাঁর বয়স ৬৫ , তাঁর নিজস্ব বয়ান অনুযায়ী তিনি প্রায় গত ২৫ বছর ধরে তাঁর স্বামীর অনুমতিক্রমে তাঁর মৃত্যুর বহুপূর্ব থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন।৩৮ বছর বয়সী এক যুবক সাদিক আলী এলো তাঁর জীবনে প্রেমের উপহার নিয়ে এবং কমলা জানালেন জীবনে এই প্রথমবার তিনি সমগ্র মন ও শরীর দিয়ে কোনো এক পুরুষকে গ্রহণ করলেন, পেলেন যৌন্যসুখের আস্বাদ। ফল মিলনের ১২ দিনের মধ্যে পরিণয়ের প্রতিশুতির শর্ত রক্ষা করতে ধর্মান্তকরণ। হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে ঝড় উঠলো: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সমিতির সদ্যস্যরা তাকে জীবন নাশের হুমকি দিলো; মোতায়েন হলো পুলিশি প্রহরা। তবে সাদিক আলী প্রাণের ভয়ে প্রেসের কাছে এই সম্পর্কের কথা অস্বীকার করলেন, বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষের বুকিং বাতিল

করতে হলো। ইসলামিক স্বেচ্ছাসেবী কমান্ডো রা তাঁর প্রতিরক্ষা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলো। তিনি এ কথা বললেন " Islam is the religion of love... Hindus have abused and hurt me. They have often tried to scandalize me. I want to love and be loved" . কমলা সুরাইয়া দাস, ইসলামিক নবোদিত প্রভাত সূর্য, দেশের ভিতরে ও একাধিক গাল্ফ দেশগুলিতে আমন্ত্রিত হল ধর্ম প্রচারক হিসেবে। হাজার হাজার নরনারী মুগ্ধ্য হয় শুনলো তাঁর বাণী, পাসপোর্টে তাঁর পরিচয় লেখা হলো " preacher " হিসেবে। উচ্ছসিত কমলা বললেন: " I never believed I would become such a symbol, like Joan of Arc...." I

কমলা দাস একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন একজন দ্বাত্বশীল সমাজ সচেতন নাগরিক। তিনি পরিত্যক্ত মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে কাজ করার জন্য ও রহস্যজনক নারী মৃত্যুর তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি আইনি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তরুণ কবিদের , বিশেষতঃ মহিলা কবিদের তিনি ছিলেন অক্লান্ত পৃষ্ঠপোষক। এই সমাজসচেতন মনোবৃত্তি তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় - বহুতান্ত্রিক ক্লাবের সদ্যস্য হিসেবে তিনি সত্তর সাদা পোশাকের গোয়েন্দাদের নজরে পড়েন, তাঁর বাবার কাছে হুমকি এলে তিনি কন্যাকে সমস্ত পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁর পথ থেকে সরে আস্তে বলেন। তাঁর স্বামী অবশ্য তাঁকে এই ব্যাপারে কোনো জোর করেননি, তবে মাধব দাস কে এর মূল্য দিতে হয়েছিল চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে। এই চাকরিহীন এগারোটি মাস এই পরিবারটি গহনা বেঁচেও জীবন যাপন করেছিল ও ছিল নজরবন্দি।তবে দাস দম্পতি প্রভূতভাবে পুরোষকৃত হয়েছিল জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার পরে। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তাই ইসলাম ধর্ম অবলম্বনের পরেও খুঁজে নিয়েছিল তাঁর পথ। তিনি পনপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেন পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীর পরিবারের কাছে বিক্রি না হয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে যা পক্ষান্তরে তাদেরকে জিগলোতে পরিণত করবে। তিনি ইসলামের বিভিন্ন parable - এর নতুন ব্যাখ্যা করেন; কোরবানি সম্পর্কে তিনি বলেন সবই যেহেতু আল্লার সৃষ্টি, তাই কারো নিজের কিছু থাকতেই পারেনা যা সে সেই সর্বাধিকারীকে দিতে পারে ; আবার এও বলেন কাফেরকে হত্যা করা জেহাদ নয়, জেহাদ নিজের ভিতরকার কলুষকে নিশ্চিহ্ন করা।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা অবিমিশ্র আনন্দ এনে দিতে পারলো না কবির জীবনে। সুরাইয়ার stardom তাঁর ওপর যে চাপ তৈরী করলো তা তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিদ্ধস্ত করে তুললো।ব্যক্তিগত জীবনের কষ্ট আরো গভীরতর হলো তাঁকে ধর্মন্তকরণে সাদিক আলী আর্থিক লাভের সংবাদে ও তাঁর আর কোনো দিন ফিরে না আসার নিশ্চয়তায়। যন্ত্রনার খানিক উপশম হয়তো হয়েছিল ডাক্তার হোসাইনের-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে , তবে ইসলাম ইমামরা যখন ফতোয়া দিলেন তিনি একই সঙ্গে একজন মুসলমান ও কবি হতে পারবেন না, তখন তিনি উদ্বেল হয়ে ওঠেন আবার মাধাবী কুট্টি হওয়ার জন্য। তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, " all mosques should be destroyed. All mosques, temples, churches." ।এবার মুসলিম কট্টরপন্থীদের কাছ থেকে হুমকি এলো, শুধু তাঁর একার নয়, কমলার গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি করেন তাঁর কৃষ্ণই তাঁর কাছে মোহাম্মদ, তিনি তাঁর পারিবারিক সর্পমন্দিরের স্বত্ব ছাড়তে অস্বীকার করলেন এবং ঘোষণা করলেন, " if you go to guruvayur, you will not see krishna there. he is with me." হিন্দু মৌলবাদীরা আরো একবার নড়েচড়ে উঠলেন।তাঁর দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত কল্যাণী নামক একটি মেয়েকে দিয়ে তাঁকে arsenic এর সাহায্যে খুন করার পরিকল্পনা হলো ।

আসলে মৌলিক সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী এই ব্যাক্তিত্বটি কোনোদিনি বাঁধা পড়েননি। কমলা দাসের জীবনীকার বন্ধুর পর্যবেক্ষণ - "... orthodoxy and rebellion coexist within her, as do other seeming contradictions ... clearly, the "love queen "veneer is simply a shiny initial layer of her many selves. What is not clear, and what I cannot yet imagine, is how complex, mercurial, many masked, and multilayered Kamala really is." তিনি সত্যি ছিলেন এক জটিল ও বহুমাত্রিক মানুষ: দূর থেকে তাঁকে অনেকেই ভেবেছেন সহজলভ্য, আর কাছ থেকে অনেকেই মনে করেছেন অতলস্পর্শী। তবে এই ব্যাপারে তাঁর সততা সুবিদিত ; তিনি তাঁর স্ববিরোধিতাগুলি সম্পর্কে সচেতন: "... we have to contradict ourselves sometimes". এই কারণেই হয়তো অনেক সাহিত্য সমালোচক দাবি করেন যে তাঁর বর্ণিত যৌন জীবনে সত্য বা ফ্যাক্ট ও কল্পনা অথবা ফিক্শন -কে পৃথক করা দুঃসাধ্য। একইরকমভাবে তাঁর স্বামীর দ্বারা শোষিত হওয়ার ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে ধরা যেমন " private is political " এই মতাদর্শের প্রতিধ্বনি, তেমনি মাধব দাসের প্রতি নির্ভরতা, তাঁর সততার প্রতি শ্রদ্ধা ও বার্ধক্যে তাঁর প্রতি গভীর মমতা তেমনি অনস্বীকার্য। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে কমলা দাসের একাকিত্বের কথা তিনি merrily wisboardকে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন: তাঁকে ছাড়া কবি নিজেকে তুলনা করেছেন এক উদ্দেশ্যহীন ও দিশাহীন ক্লান্ত সাঁতারুর সঙ্গে। এমনকি লেখক সাফল্যের পেছনে দাস প্রদত্ত নিরাপত্তাবোধ ও কুশলি ব্যবস্থাপনার কথাও বারবার উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন উক্তিতে। আর যন্ত্রণার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: " All the grief inflicted upon me by my husband paid dividends. All the struggles proved useful later. Poetry came oozing out like blood out of injuries". নারীমুক্তির ইস্যুতে তিনি সক্রিয় ও সোচ্চার, মেয়েদের আর্থিক, সামাজিক, মানসিক, এমনকি যৌন স্বাধীনতা তিনি বাঙময়, নিজেকে গবেষণায় বিষয়বস্তু করতেও পিছপা নন। আবার একই সঙ্গে তিনি ভারতের পরম্পরা, জ্ঞান, ঐতিহ্য সম্পর্কেও স্পর্শকাতর, ভারতীয়

সমাজচিত্রকে পাশ্চাত্যের বা তাঁর অনুকরণকারী ভারতীয়দের " gaze" বা দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতেও তৎপর: "I speak for the cause of female emancipation, attack the hypocrisy of conventional morality, but seek fulfilment within the nest of traditional values".

এই বিভিন্নতা কখনোই কমলা দাসের অবস্থানহীনতার পরিচায়ক নয়, সাহিত্যে ও জীবনে তিনি ছিলেন দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। কবি Blake -এর মতনই বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতাগুলিকে সরাসরি মুখোমুখি মোকাবিলা করে তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন সেই "higher Innocence "-এ। কোনো রাখঢাকের পরোয়া না করে তিনি লিখে গেছেন তাঁর চেতনায় জড়িত তাঁর প্রতিটি অনুভূতি। ফরাসি লেখক Marguerite Duras -এর মতোই তিনিও বলেন,"Write without/ A pause, don't search for pretty words which/ dilute the truth, but write in haste, of/ Everything perceived, and known, and loved...". সত্তর ও আশি দশকের ফরাসি নারীবাদী চিন্তাশীল গণ যখন উজ্জাপন করলেন বিশেষ feminine লেখেন শৈলী ("writing through the body"), তার বহু আগেই কমলা দাসের poetics - এ পড়েছিল তার ছায়া। তাঁর শব্দ চয়ন, ছন্দের ব্যবহার ও বিষয়বস্তু নিয়ে বারবার সমালোচনার ঝড় উঠেছে, কিন্তু এ সবের মুখে তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী : তিনি একবার অধ্যাপক Ezekiel - কে স্পষ্টই বলেন: "My gait is different ... When I write a poem, I am speaking, moving, my mind is dancing... With this language, which may seem distorted to you, I will bring out my emotion... If you don't like it, don't come as a buyer of my sweets". এই আপোষহীন সাহসিকতার প্রতিফলন ঘটে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর নতুন মৌলিক আত্মোপলব্ধির ঘোষণায়।তিনি এমন কোথাও বলেন যে তিনি একজন ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছেন যিনি কমলার কাছে বাস্তব ও "available", এর জন্য তাঁর আর কোনো ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। কখনো তিনি দাবি করেন ঈশ্বরকে আবিষ্কার তাঁর কাছে সন্তান প্রসবের মতনই একাধারে আশ্চর্যজনক ও বাস্তব :now that God has made me his dwelling place. And I dwell in him too, so we don't know who houses whom". মানবীয় ও ঐশ্বরিক প্রেমের এই মেলবন্ধনের কারণে তাঁকে অষ্টম শতাব্দীর সুফী সন্ত কবি রাবেয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করেন: "If I have to love a God and accept him as my owner, I have to see that he is set free first... I create my own God, it's only God and me".

স্বাধীনতালাভের বয়োপ্রাপ্তির পূর্বেকার ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য এ হেনো অচিরাচরিত ও শক্তিশালী প্রিতবাদী এক উপস্থিকে স্বস্তির চোখে দেখতে পারেনি। হয় তাঁকে কালিমালিপ্ত করার এমনকি হত্যার চেষ্টা করেছে, অথবা যেমন ঔপন্যাসিক নমিতা গোখেল মন্তব্য করেছিলেন, " Kamala's serious writing has been high jacked and diminished by a press that sensationalized her life rather than celebrating her literary stature" . তবে একজন নারীবাদী মহিলা কবি হিসেবে তাঁর সংগ্রাম নতুন নয়। কয়েক দশক পর যখন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন তাঁর কলমে তাঁর পারিপার্শিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধচরণ করেন তাঁকেও চূড়ান্ত বিড়ম্বিত হতে হয়, ছাড়তে হয় দেশ, এমনকি প্রাণ নাসের হুমকিও পেতে হয়েছিল। Hungry generation -এর বাঙালি কবিরা যৌনতাকে আবিষ্কার করেছেন নগ্ন রূপে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমসাময়িক কবিরাও এ বিষয় নিয়ে লুকোচুরি করার বিরোধিতা করেন, তাঁদের সাহিত্য জগতে সমসাময়িক কাল অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিকীকরণের চেষ্টা করলেও পরবর্তী নারীবাদী লেখকদের মতো কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের স্বীকার হতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লেখক কমলা দাসকে অস্বীকার করতে পারেনি ইঙ্গ ভারতীয় সাহিত্য, তাঁর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেনি তৎকালীন সমাজ ও। ২০০৯ সালে পুনায় তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁকে কেরলে বিভিন্ন স্থানে বিপুল জনতা তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। রাজনৈতিক নেতারাও এই জনমতকে অবহেলা করতে পারেননি, যোগ দিয়েছেন সম্মান প্রদর্শনে । এই প্রথমবার মসজিদে তাঁর কবরের পাশে একত্রিত হন বহু মহিলা। কালের প্রবাজমানোতাকে আটকাতে পারেনি বাংলা সাহিত্য। কবিতা সিংহ নিয়ে এলেন একটি feminist model, মন্দাক্রান্তা সেন বা মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রভিতি হয়েউঠলেন সমালোচকদের মতে "উগ্র", আসলে সুস্পষ্ট নির্ভীক। এ বিবর্তন থামবে না, অনুসন্ধান চলবেই:" I watch I watch I watch and I am watching with in myself" .

তথ্য সূত্র :

১ দাস কমলা। "An Introduction"

২ উইসবোর্ড, মেরিলি । 'The Love Queen of Malabar: Memoir of a Friendship with Kamala Das'. McGill-Queen's University Press: Montreal & Kingston, London, Ithaca, 2010.

জেলার নাম হুগলী

ড. নন্দিনী রায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভারতদর্শনের সময় হুগলী ছিল কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত। মনসা মঙ্গল কাব্যধারার কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর কাব্যে হুগলীর কথা পাওয়া যায়। এই কাব্যের একটি পুঁথিতে রয়েছে, ''সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ''। সে ক্ষেত্রে পঞ্চদশ শতকের অন্তিম লগ্নে কাব্যটি রচিত বলে ধরে নেওয়া যায়। ব্রিটিশ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ হুগলীর নাম উল্লেখ করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর আশির দশকে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে রচিত আবুল ফজলের ''আইন-ই-আকবরী'' বইটিতেও হুগলী নামটা আমরা পাই। হোগলা গাছ থেকে হুগলী নামটি এসেছে বলে অধিকাংশের ধারণা। তবে ডি জি ক্রফোর্ড-এর মতে হুগলী শব্দটি এসেছে গোলঘাট দুর্গের নাম থেকে। পোর্তুগীজদের গোলা থেকেও শব্দটি জন্মলাভ করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও মনে করেন পোর্তুগীজদের 'গোলা'থেকেই 'ওগোলি' হয়ে শব্দটি এসেছে। গোলা হল দুর্গপ্রাকারের বাইরের দিকে উপরের যে উদগত অংশ। মনে রাখতে হবে বিপ্রদাসের কাব্যরচনার পরে পোর্তুগীজরা ভারতে এসেছিল। আকবরের অনুমতি পোর্তুগীজদের যে ক্ষমতা দিয়েছিল তার বলে তারা হুগলীতে বানিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। যদিও তার আগে সপ্তগ্রাম বন্দরে পোর্তুগীজরা ব্যবসা শুরু করেছিলো। তখনও কিন্তু হুগলী জেলার জন্মই হয়নি। হুগলী জেলার জন্মের অনেক আগে থেকেই ছিল হুগলী। এই 'হুগলী' নামের ক্ষেত্রে যেমন পোর্তুগীজদের অবদান আছে বলে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার সহ অনেকেই মনে করেন, তেমনি এই অঞ্চলে পোর্তুগীজদের প্রভাব অবশ্যই ছিলো। সে কারণেই কবি অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি ছড়ায় লিখেছিলেন-

হাঁসের প্রিয় গুগলী,
পোর্তুগীজের হুগলী।(কোতরং)

হুগলী জেলায় প্রথম টানা পাখা এনেছিলো পোর্তুগীজেরা।এছাড়াও পোর্তুগীজেরা হুগলী তথা বাংলায় এনেছিলো সবেদা, আনারস, লাল লঙ্কা, পেঁপে, কামরাঙা, গাঁদাফুল, ভুট্টা প্রভৃতি। বেশ কিছু পোর্তুগীজ শব্দও বাংলা ভাষায় ঢুকেছে। যেমন, আয়া, আনারস, আলমারি, বিস্কুট, জানলা, আলপিন, আতা, কফি - আরো কতো শব্দ!

বর্ধমানের থেকে পৃথক হয়ে হুগলী জেলার জন্ম হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে জন্ম নিলো এই নতুন জেলা। ১৩টি থানা নিয়ে গড়ে উঠেছিলো হুগলী জেলা। এই জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সি.এ.ব্রুস। এই ১৩ টি থানার একটি ছিলো বেণীপুর। পরে এই বেনিয়াপুর বা বেণীপুরের পরিবর্তে থানা হয় বলাগড়। অন্যান্য থানাগুলি ছিলো- হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, পান্ডুয়া, ধনিয়াখালি, হরিপাল, রাজবলহাট, জাহানাবাদ, চন্দ্রকোণা, দেওয়ানগঞ্জ, ঘাটাল, বাগনান এবং আমতা। পরবর্তীকালে নতুন কিছু থানা যুক্ত হয় এবং হুগলী জেলা থেকে কিছু থানা নিয়ে গঠিত হয় হাওড়া জেলা।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যতবার লোকগণনা করা হয়েছিলো তাতে দেখা গেছে কৈবর্ত ও বাগদী জাতির জনসংখ্যা হুগলী জেলায় সর্বাধিক।এরপর আছে যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ, সদগোপ, গোয়ালা, কায়স্থ এবং তেলি জাতি।এছাড়াও সুবর্ণবণিক, তাঁতি, কামার প্রভৃতি জাতির মানুষেরও বসবাস এখানে। বৈদ্যদেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বৈদ্যবাটী,সোমড়া বা গুপ্তিপাড়ার মত অঞ্চলে।হুগলী জেলার পোলবা-র দ্বারবাসিনীতে দ্বারপাল নামক এক মাহিষ্য রাজা রাজত্ব করেছেন,তার নিদর্শনও আছে। আবার ফুরফুরা শরিফ অনেক আগে (তখনো ফুরফুরা শরিফ নাম হয়নি) এক বাগদী রাজার রাজধানী ছিলো। হুগলী জেলায় উপজাতি শ্রেণীভুক্ত মানুষ প্রচুর।তাদের মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ডোম, চন্ডাল, শবর, হাড়ি, কেওড়া, বাউরী, যুগী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ২০১১ খ্রীস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী হুগলী জেলায় বসবাসকারী তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৩ লক্ষ, ৪৪ হাজার, ২১ এবং তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ২লক্ষ,২৯হাজার ২৪৩। এই জেলায় বহুসংখ্যক মুসলমানও বাস করে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের কথাও বলা যেতে পারে। এ ছাড়াও শিখ, বৌদ্ধএবং জৈন ধর্মাবলম্বীরাও হুগলী জেলায় বাস করে। এই জেলায় কিছু রাজপুতেরও বাস। হুগলী জেলায় একসময় পোর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, বেলজিয়ান, জার্মান প্রভৃতি বিদেশীদের ঘাঁটি ও বসতি ছিলো। এ প্রসঙ্গে আর্মেনিয়ানদের কথাও বলা যায়। সুতরাং হুগলী জেলা যে 'মহামানবের মিলনক্ষেত্র' সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

বাংলা নদীমাতৃক, হুগলী জেলাও তাই।অসংখ্য নদীই এই জেলার প্রাণ।গঙ্গা,ভাগীরথী এবং দামোদর এই জেলার রূপদান করেছে। দ্বারকেশ্বর, সরস্বতী, আমোদর, কানা নদী, কুন্তী, বেহুলা, মুন্ডেশ্বরী,প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত হয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই অঞ্চলের প্রচুর নদীর কথা বলেছেন। 'নদনদীগণের কলিঙ্গদেশে যাত্রা' অংশের নদীগুলির নাম থেকে সে সময়ের নদীমাতৃক বাংলার ছবিটি চমৎকার ফুটে ওঠে-

ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা
অজয় সরস্বতী।

ধাইল কুন্তী বেগে ধায় গোমতী
সরযূ সুধাবতী।।

তিরিশটিরও বেশী নদীর নাম সেখানে রয়েছে। বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্যেও এই অঞ্চলের নদীর বিবরণ আছে। তবে বর্তমানে সরস্বতী বা কানা নদীর মতো অনেক নদীই মজে গিয়েছে।প্রচুর খাল-বিলও রয়েছে এই জেলায়। সুতরাং এই জেলার কৃষিপ্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। ধান, পাট, আম, কপি, লঙ্কা প্রভৃতি উৎপাদনে এই জেলা এগিয়ে রয়েছে।আলু এবং সবজি উৎপাদনে এই জেলার ভূমিকা শুধু বাংলায় নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। মাছচাষে এই জেলার অবদান যথেষ্ট । ব্যবসা এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও এই জেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে হুগলী জেলায় নীলচাষ শুরু হয়।রামমোহন, দ্বারকানাথ,প্রসন্নকুমার প্রমুখ বাংলায় নীলচাষকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সে সময়। বাংলায় প্রথম নীলচাষ শুরু করেন লুই বনার (Louis Bonard) নামক এক ফরাসী হুগলীর তালডাঙায় ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে।জর্জ টয়েনবির মতে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে নীলচাষের সূচনা। "The industry appears to have been introduced into the Hoogly district as early as 1780." (A sketch of administration of Hoogly District)। হুগলীজেলার বাঁশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া, কালিকাপুর, রাজপুর এবং আরো বহু স্থানে নীলকুঠি ছিলো।নীলকর সাহেবদের সঙ্গে কিছু জমিদারও যোগ দিয়েছিলো নীলের ব্যবসায়। নীলকর সাহেবদের থেকে অত্যাচারে পিছিয়ে ছিলোনা এদেশের সহযোগীরাও।গোমস্তা বা দেওয়ানদের অত্যাচারও ছিলো অবর্ণনীয়।দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের চরিত্র গোপীর বক্তব্য, ''সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়,.....''। হুগলী গেজেটিয়ারে ও'ম্যালি লিখেছিলেন, "The scene of Nildarpan (Mirror of Indigo), aBengali drama of the late Dinabandhu Mitra–is said to have been laid in an Indigo factory of Bansberia." যদিও এনিয়ে বিতর্ক আছে। ভারত সংস্কারক 'পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো, নদীয়ার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশাই এই নাটকের ভিত্তি।আবার কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের পোস্টমাস্টার হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন-

কুঠিয়ালের মেজেষ্টরি,
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি,
মার্ত্তে আমাদের। (নীলকর)

পরবর্তী কালে নীলবিদ্রোহ ইংরেজদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিলো।নীলকমিশন গঠিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টব্দে।ধীরে ধীরে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

এই জেলার রেশমবস্ত্র উৎপাদনও ছিলো উল্লেখযোগ্য। লবণের ব্যবসাও ছিলো নবাবী আমলে জমিদারদের আয়ের অন্যতম উৎস। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজরাও নেমে পড়ে লবণ ব্যবসায়।পরবর্তীকালে লবণের ওপর অত্যধিক মাত্রায় কর বসানো হতে থাকে। লবণের দাম বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ে। ধীরে ধীরে লবণ আমদানি বৃদ্ধি পায়।এ ছাড়াও পাটশিল্পে একসময় এই জেলার নাম ছিলো। রেশম ছাড়াও অন্যান্য বস্ত্র উৎপাদনে হুগলী জেলার ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। চিকন শিল্প বা জরি শিল্পের কথা বলা যেতে পারে। একসময় মসলিন উৎপাদনেও এই জেলা ছিলো সুপরিচিত। এই জেলার মলমলখাস ছিলো জগদ্বিখ্যাত। এখনো এ জেলার তাঁতশিল্প যথেষ্ট গুরুত্ব দাবী করতে পারে। ধনেখালির তাঁতের শাড়ির সুনাম আজও অক্ষুণ্ণ। হুগলী জেলার ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়িও জনপ্রিয়। ধুতির ব্যবহার কমে গেছে, কিন্তু ফরাসডাঙার ধুতির কথা তো বলতেই হয়। বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য যখন তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি বাঙালীর আগ্রহ জন্মায়। জন্ম নেয় উপেন্দ্রনাথ সেনের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস হুগলী জেলায়। ডানলপ রবার কোম্পানিও স্বাধীনতার আগেই স্থাপিত। স্বাধীনতার ঠিক আগে ভারতবর্ষের প্রথম গাড়ী নির্মাণের কারখানা হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডও এই জেলারই কারখানা। ত্রিবেনী টিস্যু আর কেশোরাম রেয়নের কথাও বলতে হয়।এছাড়াও স্বর্ণ শিল্প, চর্মশিল্প, মাদুর শিল্প, শঙ্খ শিল্প, শোলা শিল্প প্রভৃতি এই জেলায় শিল্পের মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও এ জেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গৃহস্থালির মাটির পাত্র তো আছেই, এ ছাড়াও এখানকার মৃৎশিল্পীরা টেরাকোটার কাজে দক্ষ ছিলেন।তার প্রমাণ বহন করে এ জেলার প্রায় আড়াইশোটি মন্দির। দশঘরার হাতের তৈরি কাগজের কথাও বলা উচিৎ। বর্তমানে অনেক প্রাচীন কারখানা যেমন উঠে গেছে,তেমনি বেশ কিছু নতুন কলকারখানাও স্থাপিত হয়েছে এই জেলায়। সম্প্রতি বলাগড়ের ঐতিহ্য নৌশিল্পকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পাটুলির ঝিলে ভাসমান বাজারের জন্য বেশ কিছু নৌকার বরাত দেওয়া হয়েছে। মিষ্টির ক্ষেত্রেও এই জেলার সুনাম সুপ্রাচীনকাল থেকেই।জনাইয়ের মনোহরা, চন্দননগরের তালশাঁস, হরিপালের দই, কামারপুকুরের বোঁদে, খানাকুলের কলাকাঁদ, গুপ্তিপাড়ার গুপো সন্দেশ - মাখা সন্দেশ, সোমড়ার কাঁচাগোল্লা, ভান্ডারহাটির রসগোল্লা, ধনেখালির খইচুর আজও মিষ্টিপ্রেমী বাঙালির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সূর্য মোদক, ফেলু মোদক, ললিত ময়রা, ঘেঁটু ময়রা, পরাণ মোদক, হরিমোহন মোদক, ঘাটের ময়রা, বলাই ময়রা প্রমুখের মিষ্টি হুগলীর মিষ্টিশিল্পের ঐতিহ্যেরই প্রতীক। ভীম নাগ এবং নবীন চন্দ্র দাসও এই জেলারই সুসন্তান।

শিক্ষাবিস্তার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে হুগলী জেলা বাংলার অধিকাংশ জেলার থেকেই এগিয়ে ছিলো।ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে হুগলী জেলায় ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ফুরফুরা, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ছাড়া এ জেলায় মক্তবও ছিলো। মুসলমান রাজত্বকালে এইভাবেই কিছুটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল।যদিও নারীশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা সেই আমলে হয়নি। হওয়ার প্রশ্নও ছিলোনা। ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে পোর্তুগীজ জেসুইট ফ্রান্সিসকো ফার্নান্ডেজ এবং ডোমিঙ্গো ডিসুজা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ফরাসী জেসুইট কর্তৃক আরেকটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিলো ব্যান্ডেলে। হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে এই তথ্য পাওয়া যায়। হুগলী জেলায় শিক্ষার বিস্তারে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে যোশুয়া মার্শম্যানের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয়েছিলো একটি বিদ্যালয় এবং তাঁর স্ত্রী হানা মার্শম্যানের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিলো বাংলার প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়।এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন উইলিয়াম কেরী, জন টমাস, যোশুয়া মার্শম্যান প্রমুখ। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো ধর্মপ্রচার। সেই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাইবেল ছাড়াও কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতও প্রকাশিত হয়েছিলো।যদিও পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থও মুদ্রিত হয়। প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র সাপ্তাহিক 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। 'সমাচারদর্পণ'ও প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই। রেভারেন্ড মে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চুঁচুড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই দশকে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এই জেলায়। ইংরাজী স্কুল এবং বাংলা স্কুল এই দুই রকমের বিদ্যালয়ের কথা বলা হতো তখন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 'নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ক্ষুদ্রগঙ্গাতীরবর্ত্তী চুঁচুড়া শহরে রবার্ট মে (Robert May) নামক লন্ডন মিশনারি সোসাইটিভুক্ত একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন।" সেক্ষেত্রে শ্রীরামপুরে মার্শম্যান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিকে বলা হয় প্রথম বাংলা স্কুল। আবার ইংরাজী বাংলা স্কুলও ছিলো। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লালবিহারী দে প্রতিষ্ঠিত গুপ্তিপাড়ায় স্কুল সম্পর্কে লেখা হয়েছিলো- ''সদ্বিধান বিদ্যানুরাগী সুযোগ্য খ্রীষ্টধর্মোপদেশক শ্রীযুক্ত রেভারেন্ড লালবিহারী দে প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রমপূর্বক গুপ্তিপাড়া গ্রামে যে এক ইংরাজী বাংলা পাঠশালা প্রস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কার্য অতি উত্তমরূপে নির্বাহ হইতেছে।" বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে টোল এবং চতুষ্পাঠীরও ভূমিকা রয়েছে। বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, ভদ্রেশ্বর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানে টোল বা চতুষ্পাঠী ছিলো।

শ্রীরামপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক পরে নারীশিক্ষায় বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নেয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং বিদ্যাসাগরের নিরলস প্রচেষ্টায়।এ বিষয়ে ব্যঙ্গ করে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন-

একা বেথুনএসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন।ভারতের নারী শিক্ষায় ইংরেজ সরকার উদ্যোগী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে হ্যালিডের ভূমিকাও ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শুধু হুগলী জেলাতেই মেয়েদের জন্য কুড়িটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগরের এই অবদান হুগলীর নারীরা কোনোদিন ভুলবেনা। শুধু নারীশিক্ষাবিস্তারেই নয় সামাজিক আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। উইলিয়াম কেরীর তত্ত্বাবধানে এই কলেজে উচ্চশিক্ষার সূত্রপাত।এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৮ বছর পরে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুলাই হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের পয়লা অগাস্ট চুঁচুড়ায় হুগলী মহসীন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় হাজী মহম্মদ মহসীনের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই কলেজের নাম প্রথমে ছিলো 'COLLEGE OF MOHAMMAD MOHASIN'।১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ চন্দননগর কলেজের সূচনালগ্ন। ফাদার ম্যাগলোয়ার বার্থ 'একোল দ্য সাঁত মারি' বা 'সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশন' নামে একটি শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বাংলা ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। সেখান থেকেই কালক্রমে চন্দন নগর কলেজের জন্ম। এই কলেজের নাম স্বাধীনতার আগে ছিলো ডুপ্লে কলেজ। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে এর নাম হয় চন্দননগর কলেজ। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো রাজা প্যারীমোহন কলেজ। এই কলেজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রথমে এই কলেজের নাম ছিলো উত্তরপাড়া কলেজ। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে এই কলেজের নাম হয় রাজা প্যারীমোহন কলেজ। স্বাধীনতার পরে বহু কলেজ স্থাপিত হয়েছে এই জেলায়। এই জেলার চুঁচুড়ায়১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিলো একটি কৃষি-বিদ্যালয়। তবে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো একটি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর স্কুল অফ ইন্সট্রাকশন স্থাপিত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'কলেজ

অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর'। এছাড়াও হুগলী জেলায় রয়েছে আর্ট স্কুল,মিউজিক কলেজ,সার্ভে ইন্সটিটিউট এবং বেশ কিছ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।এতদিন পর্যন্ত হুগলী জেলায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিলোনা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হুগলীতে দেশের প্রথম গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করেছে। এই পরিবেশবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই হুগলী জেলার গর্বের কারণ হবে।

একসময় ভারতবর্ষ তথা বাংলার অন্যান্য জায়গার মতো হুগলী জেলাতেও অনেক কুপ্রথা ছিলো। যেমন- সতীদাহ, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, নরবলি, গঙ্গায় জীবন বিসর্জন প্রভৃতি। দাস ব্যবসাও এই জেলার দরিদ্র মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনার কারণ হয়েছিলো। ভারতবর্ষে দাসব্যবসা ইংরেজ আমলের অনেক আগে থেকেই ছিলো। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বহু ক্রীতদাস বিদেশে পাঠানো হতো। হুগলীসহ সমগ্র বাংলায় দাসব্যবসা প্রচলিত ছিল। হুগলী ,চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে ক্রীতদাসদের বিক্রির জন্য হাট বসতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এই ব্যবসায় লাভবান হতো। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ডাকাতির দায়ে প্রাণদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনকে ক্রীতদাস করা হতো।১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ক্রীতদাস রপ্তানি নিষিদ্ধ হলেও এই ব্যবসা বন্ধ হয়নি। এর পরে বেশ কিছুদিন এই ব্যবসা চলেছিলো। চন্দননগর থেকে মরিশাস দ্বীপে ক্রীতদাস পাঠানো হতো।এবিষয়ে ফরাসী সরকারের ভূমিকা খুব গৌরব জনক নয়। যদিও ১৮৪৮ সালে ফরাসী সরকার এই ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা যেমন হুগলী জেলায় ছিলো, তেমনি কুপ্রথার বিরুদ্ধে বাংলা তথা হুগলী জেলায় আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিলো। হুগলী জেলার কৃতী সন্তান রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রামমোহনের বৌদি ছিলেন এই কুপ্রথার শিকার। বাংলার মধ্যে হুগলী জেলায় সতীদাহ হয়েছে সবথেকে বেশী। হুগলী জেলা পুণ্যক্ষেত্র বলে পরিচিত ছিলো বলেই সম্ভবত এটা হয়েছিলো। উইলিয়াম কেরী এবং রামমোহনের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সার্থক হয় যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে সতীদাহ নিবারণের জন্য আইন করলেন।রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ এ কারণে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। ১৮১৮ ও ১৮১৯ সালে যখন তিনি এই দুটি পুস্তক লিখছিলেন,তখন বাংলায় সহমরণের সংখ্যা প্রায় ৯০০-র কাছাকাছি ছিলো। আরো একটি বই তিনি লিখেছিলেন সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করে। বইটির নাম, 'সহমরণ বিষয়'। তাঁর লেখায় ঐ কুপ্রথার যে চিত্র ফুটে ওঠে তা বড়ই করুণ। ''তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধ কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নিদেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ।" ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কৌলীন্যপ্রথার কুফল সমগ্র বাংলার মতো হুগলী জেলাতেও মেয়েদের যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'কাব্যে এক নারীর বক্তব্য—

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়েচেয়ে।।

রামনারায়াণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে লেখা। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিলো চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের পারিবারিক মঞ্চে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। রূপচাঁদ পক্ষী এই নাটকে গান বেঁধেছিলেন।এই নাটকে দেখি কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার অবিবাহিতা কন্যার বয়স ৩২,২৬,১৪ এবং ৮। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাঁর চার কন্যার বিয়ে এক মূর্খ বৃদ্ধের সঙ্গে দিতে বাধ্য হলেন।কুলীন কন্যাদের জীবনের যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে এই নাটকে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৌলীন্যপ্রথাকে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন, ''শতেক বিধবা হয় একের মরণে।" কিংবা, ''এযে কুল কুল নয় সারমাত্র আঁটি।" বিদ্যাসাগরের তালিকা অনুযায়ী হুগলী জেলায় ৫০ থেকে ৮০টা বিয়ে করেছে এমন কুলীনের সংখ্যা কম নয়। হুগলী জেলায় 'বসো'র ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০টি বিয়ে করেছিলেন, 'ভুঁইপাড়া'র বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৭০টি এবং 'দেশমুখো'র ভগবান চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন ৬৪টি বিয়ে। বাংলায় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিদ্যাসাগর এবং রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিলো। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, ''রাজ্যশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক তাহার কোন হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না (৪)।" তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৭১ ও ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে। সমাচার দর্পণ পত্রিকায় 'চুঁচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণস্য' পত্রে এই জেলার নারীদের যন্ত্রণার ছবিটি ফুটে উঠেছে (৫)। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন পাস হয়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন।তিনি লিখেছিলেন-

সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ- ঘটন।। (বিধবা বিবাহ আইন)

বা

বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।

সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে?(বিধবা বিবাহ আইন)

আবার হুগলী জেলার চন্দননগরের খলসিনীর 'ধীরাজ' (বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়) লিখেছিলেন,

''বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম''।

বিদ্যাসাগরও ধীরাজের বিভিন্ন গান শুনতে পছন্দ করতেন বলে জানা যায়।

শান্তিপুরের তাঁতীরা বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি বানালেন। ঐ ধুতির উল্লেখ দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী 'প্রহসনে নিমচাঁদের সংলাপে রয়েছে— ''তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ-মাতার মাঝখানে সিতে,গায় নিনুর হাফ চাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা,.....আঙ্গুলে দুটি আংটি-''।

বিদ্যাসাগর কিন্তু ছিলেন অবিচল। এই আইনের বিরুদ্ধে বহু আবেদনপত্র পেশ কর হয়েছিলো,হাজার হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছিলেন।কিন্তু এ আইন রদ হলোনা। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দেই ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিয়ে হলো বিধবা লক্ষ্মীমণি দেবীর। মনে রাখতে হবে এই বিতর্কে হুগলী জেলায় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে যেমন ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতেরা ছিলেন, তেমনি তাঁর পক্ষেও অনেকে ছিলেন।

হুগলী জেলার আর একটি সমস্যা একসময় প্রশাসনকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। তা হলো ডাকাতের উপদ্রব। জর্জ টয়েনবি লিখেছিলেন, "The history of the Hooghly district between 1795 and 1845 is practically a history of dacoity." (George Toynbee -A sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845, Bengal Secretariat Press. pp-41-42) (১৮৮৮)। অবশ্য বাংলার সর্বত্রই সেই সময় ডাকাতদের অত্যাচার ছিলো। তারা ডাকাতিও করতো,মানুষকে হত্যাও করতো। জলপথ বা স্থলপথ -কোনোটাই নিরাপদ ছিলোনা। ডাকাতদের নিষ্ঠুরতায় সন্ত্রস্ত ছিলো মানুষ। হুগলী জেলার ডুমুরদহের বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ রায়ের নাম শুনেই আতঙ্কিত হতো সারা বাংলার মানুষ। যদিও বিশ্বনাথের সহৃদয়তা সম্পর্কেও অনেক গল্প প্রচলিত। এক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে বিশে ডাকাতের ভয়ে এক বৃদ্ধাকে রেখে নাকি সবাই পালিয়ে গিয়েছিলো এবং বৃদ্ধা তাকে যত্ন করে আহার করানোর পর তাঁর নানা কষ্টের কাহিনী নাকি জানিয়েছিলেন। এর পর বিশে তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলো এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্যও আদায় করে দিয়েছিলো। বিশ্বনাথ সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন বিশে ডাকাত বাগদী। জমিদাররাও অনেক সময় ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকতো।বিশে ডাকাত ছাড়াও গুমান রায়, কেশব রায়, রাধা চঙ্গ, পীতাম্বর, শ্যাম মল্লিক, বৈদ্যনাথ, কেনারাম সর্দার, সিধু মাইতি, বেণী দত্ত, গগন সর্দার এবং অন্যান্য ডাকাতদের ভয়ে কাঁপতো হুগলীর মানুষ। এই কারণে ডাকাতি কমিশন গঠিত হয় ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে।

হুগলী জেলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস।বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই জেলার প্রাণ। তারকেশ্বর এই জেলার তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য তীর্থযাত্রী শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরে যায় শিবের মাথায় জল ঢালতে। হুগলী জেলায় শিবের অনেক মন্দির রয়েছে। চুঁচুড়ার শ্রীশ্রীষন্ডেশ্বরজীউ নামক শিবঠাকুরের মন্দির রয়েছে। এখানে চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হয়। দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো,ক ালী পুজো,কার্তিকপুজো বেশ ধুমধাম করেই এ জেলায় হয়। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গুপ্তিপাড়া,বৈদ্যবাটী, সোমড়া প্রভৃতি স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুর্গাপুজো আজও বাংলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।এছাড়াও বহু বারোয়ারি দুর্গা পুজো সমগ্র হুগলী জেলা জুড়েই হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বাংলার প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় গুপ্তিপাড়ায়। গুপ্তিপাড়ার বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর এখানেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তবে চন্দননগরে অজস্র জগদ্ধাত্রী পুজো হয় এবং সমগ্র বাংলায় এখন জগদ্ধাত্রী পুজোর ক্ষেত্রে চন্দননগরের গুরুত্ব এবং আকর্ষণ অনেক বেশী। প্রচলিত আছে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেন। আর একটি মত অনুযায়ী চন্দননগরে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। তবে জগদ্ধাত্রী দেবীর মন্দির বা পুজোপ্রকরণ অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হয়তো গৃহস্থ বাড়ীতে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। বারোয়ারি মাতঙ্গী পুজো হয় বৈদ্যবাটীতে। হুগলী জেলা মাতৃসাধক রামকৃষ্ণের জন্মভূমি। সেখানে তাঁর মন্দির নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণিও হুগলীর কোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হুগলীজেলায় কোনো পীঠস্থান অর্থাৎ মহাপীঠ নেই। তবে বলাগড়ে রয়েছে একটি শক্তিপীঠ- বলয়োপপীঠ। এই চণ্ডী মন্দিরে রয়েছে পঞ্চমুন্ডীর আসন। হুগলী জেলার সিঙ্গুর, গুপ্তিপাড়া সহ বহুস্থানে অজস্র কালীমন্দির আছে। সিঙ্গুরে আছে ডাকাতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালী। কোতরং-এ রয়েছে দেবী ভদ্রকালীর মন্দির।শেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী কালীর পুজো হয়। দেবীর নামেই এই অঞ্চলের নাম। বাঁশবেড়িয়ার দেবী হংসেশ্বরীর মন্দিরে দেবীর পুজো হয়। চুঁচুড়ার মহিষমর্দিনী, চন্দননগরে কার্তিক পুজো এবং রাজরাজেশ্বরীর পুজো উল্লেখযোগ্য।কোন্নগরেও রাজরাজেশ্বরী পুজো হয়।শিয়াখালায় হয় দেবী উত্তরবাহিনীর পুজো।ধনেখালির পলাশীতে পতিদুর্গামাতার মন্দির আছে। এখানকার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নয় -হাড়ি জাতির।

ভাস্তাড়ায় চামুন্ডা দেবীর মন্দির আছে। হরিপালে রয়েছে বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তি। বলা হয় চন্ডাল কন্যা বিশালাক্ষী। কলাছড়াতেও আছে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির। রাজবলহাটে পূজিতা হন দেবী রাজবল্লভী।আঁটপুরে রয়েছে রাধাগোবিন্দ জীউয়ের মন্দির। দ্বারহাট্টা গ্রামে দ্বারিকাচন্ডীর মন্দির আছে। শেওড়াফুলিতে রাজপরিবারের কুলদেবী সর্বমঙ্গলার পুজো হয়। কোতরং-এর ধর্মতলায় রয়েছে ধর্মঠাকুরের মন্দির। এখানে ধর্ম ঠাকুরের পাশে রয়েছে দুটি শিবলিঙ্গ। ধর্ম ঠাকুরের পুজো এখানে বড়ো করেই হয়। এছাড়াও লক্ষ্মী পুজো, মনসা পুজো, শীতলা পুজো, মঙ্গলচণ্ডীর পুজো,গঙ্গা পুজো, ষষ্ঠীপুজোসহ আরো অনেক দেব-দেবীর পুজো এই জেলায় প্রচলিত। জনশ্রুতি আছে গুপ্তিপাড়ায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো মঙ্গল চন্ডীর আশীর্বাদেই। নারায়ণের পুজো বহু পরিবারেই হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেই শ্রীধর গৃহদেবতা। এছাড়া সত্যনারায়ণের পুজোও হয় হুগলী জেলায়। হুগলীর বেগমপুরে ধুমধাম করে অকাল বিশ্বকর্মা পুজো হয়। দুর্গাপুজোর তিনমাস পরে এই পুজো হয় নবমী থেকে একাদশী পর্যন্ত। বৈঁচি গ্রামে পুজো হয় সর্পদেবী জগৎগৌরীর। ত্রিবেণী, মগরা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সরস্বতী পুজোর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। রঘুনাথপুরে রয়েছে রাজা রামমোহনের উপাসনাগৃহ। এ জেলায় মাহেশের রথযাত্রা বিখ্যাত।গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রাও উল্লেখযোগ্য। দোলযাত্রাও পালিত হয় এই জেলায়। মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ায় রথের মেলা প্রসিদ্ধ।এ ছাড়াও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মেলা, খানাকুলের বারুণী মেলা, মানকুন্ডুর রাসের মেলা, দশঘরার দোলের মেলা, তারকেশ্বরের গাজনের মেলা, ত্রিবেণীর পৌষ সংক্রান্তির মেলা, মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ার স্নানযাত্রার মেলা প্রভৃতি এই জেলার উল্লেখযোগ্য মেলা। নবান্ন উৎসবও এই জেলায় পালিত হয়। প্রচুর ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস এই জেলায়। তাই ইদুজ্জোহা, মহরম, শবেবরাত প্রভৃতিও গুরুত্ব সহকারে পালিত হয় এই জেলায়। হুগলীর ইমামবাড়ার মহরমের মেলা বিখ্যাত।ফুরফুরায় বসে পীরের মেলা। কোতরং-এ রয়েছে মাণিকপীরের সমাধি।এখানে মাণিক পীরের উৎসব হয়। ত্রিবেণীতে আছে জাফর খাঁ গাজীর দরগা। পান্ডুয়ায় আছে পীরপুকুর। ভক্তদের বিশ্বাস এখানে আছেন সত্যনারায়ণ এবং তাঁর দুটো কুমীর। গুপ্তিপাড়ার ফুলতলায় আছে সোলেমন বাবার আশ্রম। চুঁচুড়ার ইমামবাড়া পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।জাঙ্গীপাড়ার ফুরফুরা মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র স্থান। হুগলী জেলায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা বড়দিন পালন করে। বাংলার প্রাচীনতম গির্জা চুঁচুড়ার ব্যান্ডেল চার্চে ঐদিন বহু মানুষের সমাগম হয়। বহু ধর্মের মানুষের উৎসবে এই জেলা মেতে ওঠে। মন্দির- মসজিদ-গীর্জা এই জেলায় পাশাপাশি অবস্থিত দেখতে পাই। তাই বলা যায় হুগলী জেলা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মিলনস্থান।

বাংলা সাহিত্যে হুগলী জেলার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের জন্মস্থান হিসেবে বর্ধমান এবং হুগলী দু জেলারই দাবি রয়েছে। সিদ্ধি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কেউ বলেন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত এই গ্রাম, আবার কারো মতে হুগলী জেলার। তবে মনে রাখতে হবে সে সময় হুগলী জেলার জন্ম হয়নি।অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ ভেঙে গঠিত হয় হুগলী জেলা। সুতরাং, এই বিতর্ক স্বাভাবিক। এর মীমাংসাও সহজ নয়। মঙ্গলকাব্যধারায় কবিকঙ্কন মুকুন্দের স্থান সর্বাগ্রে। তিনি তারকেশ্বরের কাছে অবস্থিত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হুগলী জেলা গঠিত হওয়ার অনেক আগেই ষোড়শ শতাব্দীতে। মানবিক রসসমৃদ্ধ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (অভয়ামঙ্গল)সুদীর্ঘ কালসীমা অতিক্রম করে আজও পাঠকের ভাবনার খোরাক হয়।তাঁকে কবি চসার এবং ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ই.বি.কাউয়েল। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারায় হুগলীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কালকেতু,ফুল্লরা,ভাঁড়ু দত্ত,মুরারী শীল প্রভৃতি চরিত্র মুকুন্দের লেখনীতে আজও অম্লান। সেকালের বাংলার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র তাঁর কাব্যে চমৎকার ধরা পড়েছে। হুগলী জেলার বিভিন্ন নদীর উল্লেখ পাই আমরা মুকুন্দের কাব্যে। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার ষোড়শ শতাব্দীর খেলারামও হুগলী জেলার কবি। পশ্চিমপাড়া গ্রামে কবির নিবাস। যদিও এই কবির অস্তিত্ব সম্পর্ক কেউ কেউ সন্দিহান। বেলডিহা গ্রামে ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মাণিক গাঙ্গুলীর নিবাস ছিলো। এই কাব্যধারার আরেক কবি সপ্তদশ শতাব্দীর রামদাস আদকের নিবাস আরামবাগের মহকুমার হায়াৎপুরে। এই জেলারই কবি বৈষ্ণব পদকর্তা মনোহর দাস।আউলিয়া মনোহর দাস বদনগঞ্জে বাস করতেন। বদনগঞ্জে তাঁর সমাধি আছে। তাঁর নামে একটি মেলাও এখানে হয়। তিনি সখীভাবে সাধনা করতেন বলে প্রচলিত আছে। মনোহর দাসের 'পদসমুদ্র' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ ছিলো হারাধন দত্ত ভক্তনিধির কাছে। কিন্তু সেটি মুদ্রিত হয়নি, হারিয়ে গেছে। এছাড়াও 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হুগলী জেলায় বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম। বলা যেতে পারে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে তাঁর অবস্থান। হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে(তৎকালীন বর্ধমান জেলায়) জন্মগ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পৈতৃক সম্পত্তি হারান বর্ধমানের মহারাজার কাছে। মাতুলালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেন।তাঁর বিবাহ নিকটাত্মীয়দের খুশী করেনি। বিয়ের পরেও তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় অব্যাহত থাকে। বিনাদোষে বর্ধমানের রাজা ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। এরপরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হন এবং সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থাকেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি দেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাংলা কাব্যের মণিহারের উজ্জ্বল এক রত্ন। এই কাব্যের প্রথম খন্ড 'অন্নদামঙ্গল', দ্বিতীয় খন্ড 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য আর তৃতীয় খন্ড 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রকে বলা হয় যুগসন্ধিক্ষণের কবি। নতুন ও পুরনো যুগের বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

নূতন মঙ্গল আসে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

এই নতুন রীতির মঙ্গলকাব্যে দেবতা সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। মর্ত্যের ধুলো লেগেছে তাঁদের গায়ে। এই কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর কণ্ঠে শোনা গেছে বাঙালীর চিরন্তন চাহিদার কথা-

''আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।''

কৌতুক ও বিদ্রূপের ছোঁয়ায় নাগরিক কবির এই কাব্য অভিনব। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ছাড়াও তিনি লেখেন 'চন্ডী নাটক', 'সত্যপীরের পাঁচালী', 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থ।এর পর বাংলা সাহিত্যে যে শুন্যতা দেখা গেলো, সেখানে আবির্ভূত হলেন কবিওয়ালারা। স্থূল দেহসম্ভোগ ছিলো যাঁদের কাব্যের আকর্ষণ। যদিও কবিওয়ালাদের রচিত কিছু পদ শিল্পোৎকর্ষে মন ছুঁয়ে যায় শ্রোতা এবং পাঠকের। এই কবিদের মধ্যে হরু ঠাকুরের পুত্র ভোলা ময়রার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হুগলীর গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা। আবার অ্যান্টনী কবিয়ালও গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় সঙ্গীত রচয়িতা কালী মির্জার জন্ম হয়।তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো কালিদাস মুখোপাধ্যায়। টপ্পা সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম নয়। কালী মির্জার যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও ছিলো। বহু শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগে হুগলী জেলার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে।প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্য ছিলো পুঁথির উপর নির্ভরশীল। প্রধানত চিঠিপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলো গদ্যের ব্যবহার। তাও নিদর্শন পাওয়া যায় খুবই কম।ব১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফ ছাপার জন্য মুদ্রাযন্ত্রর ব্যবস্থা হুগলী জেলাতেই প্রথম করেন এঞ্জুজ। প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্র্যানসি হ্যালহেডের 'A grammar of the Bengali Language'। সুতরাং বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো হুগলীর শ্রীরামপুর থেকেই। হ্যালহেডের এই বইটিতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। গদ্যের নিদর্শন স্বরূপ রয়েছে জগতধীর রায়ের লেখা একটি চিঠি। হ্যালহেডের লেখা ভূমিকাটিতে সে সময়কার বাংলা গদ্যের করুণ অবস্থার চিত্র ধরা পড়ে। এই ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে হ্যালহেড কিন্তু প্রথম বাংলা ব্যাকরণের বই লেখেননি। অনেক আগেই পোর্তুগীজ মিশনারি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ (Manoel da Assumpcam) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এবং বাংলা-পোর্তুগীজ, পোর্তুগীজ- বাংলা অভিধান রচনা করেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন থেকে প্রকাশিত এই বইটির নাম 'Vocabolario em idioma Bengalla– e Portuguez dividido em duas Partes'। বইটি রোমান হরফে মুদ্রিত। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন, ''কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ''। তাঁর পাশাপাশি দোম আন্তোনিও লেখেন,'ব্রাহ্মণ -রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ'। এই বইটিও লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয় ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে।হ্যালহেডের বইটির জন্য চার্লস উইলকিন্স কাঠে অক্ষর খোদাই করেছিলেন। পরে পঞ্চানন কর্মকারকে তিনি এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। সুতরাং হুগলী জেলায় মুদ্রণের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পিছনে হ্যালহেড,উইলকিন্সের পাশে পঞ্চানন কর্মকারেরও অবদান রয়েছে। পরবর্তী কালে পঞ্চানন কর্মকার নিরলস পরিশ্রম করে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেন।

পরিশেষে বলা যায় পর্যটনশিল্পেও হুগলী জেলা এখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাংলার ঐতিহ্যসন্ধানী পর্যটক হুগলীর মন্দির, মসজিদ, গীর্জা- গুপ্তিপাড়ার সেনবাড়ির দুর্গাপুজোর মতো ঐতিহ্যবাহী পুজো বা প্রথম বারোয়ারি পুজোর সন্ধানে আজও যায় এই জেলায়। যায় সবুজ দ্বীপের মতো সুন্দর জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খোঁজে। আর যায় বিখ্যাত গুপো সন্দেশ, মনোহরা, মাখা সন্দেশ, ঘেঁটু মোদকের রসগোল্লায় রসনা তৃপ্তি করতে।

সুন্দরবনের প্রহেলিকাময় অধ্যায়

প্রভাকর বিশ্বাস,
ইতিহাস বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চল আজ ঐতিহাসিকদের কাছে এক প্রহেলিকাময় অধ্যায়। বর্তমানে এই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য অসংখ্য নদ-নদী ও তার শাখানদী এবং সেখানে বসবাসরত প্রাণীজগৎ এই সুন্দরবনকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিভিন্ন সময়ে এই সুন্দরবন অঞ্চলে মানব বসতি গড়ে উঠেছে এবং কালের নিয়মে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে একের পর এক সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগর তীরভূমি, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলা বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বৃহদাংশ এই সুন্দরবন। অর্থাৎ বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের একাংশ এবং ভারতের ম্যানগ্রোভ বনের একাংশ (পশ্চিমবঙ্গের) সুন্দরবন নামে পরিচিত। এই দুই দেশের সুন্দরবন নিয়েই বৃহত্তম সুন্দরবন। সর্বমোট প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের (সুন্দরবনের) মধ্যে প্রায় ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশ রয়েছে। বাকি অংশ ভারতে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের (পশ্চিমবঙ্গের) সুন্দরবন 21°31' হতে 22°38' উত্তর অক্ষাংশ এবং 88°5' হতে 90°28' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। প্রবাহমান গঙ্গা নদী নিম্নবঙ্গে (Lower Bengal) অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অসংখ্য বদ্বীপ সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই বদ্বীপগুলি অর্থাৎ নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূভাগই ভারতের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন।

বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহদাংশ পুরাকালে বঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। দীর্ঘ অতীতে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের সর্বোত্র সমুদ্র ছিল। প্রবাহমান গঙ্গা নদী সেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয়ের গোমুখ গুহা থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সবশেষে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে; যাকে এই প্রবাহমান গঙ্গা নদীর মোহনা বলা হয়। গঙ্গা নদী তার এই দীর্ঘ পথ ধরে বাহিত হবার সময় হিমালয় থেকে বয়ে আনা পর্বতরেনু পলি আকারে এই মোহনাতে জমা করে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছোট-বড় অসংখ্য চর ও দ্বীপ গঠন করে চলেছে। এই গঠন পক্রিয়া আজও চলমান। গঙ্গার শাখা পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যভাগের এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের পরবর্তী রাজনৈতিক নাম হয়েছিল বাগড়ী।

এ.এফ.এম আবদুল জলিল প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় বদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা কীরূপ ছিল তার বর্ণনা তিনি তাঁর তসুন্দরবনের ইতিহাসদ নামক গ্রন্থে এই ভাবে দিয়েছেন- তনবীনচন্দ্র দাস তাঁহার এশিয়ার প্রাচীন ভূগোল (Ancient Geography of Asia) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয় নাই এবং উহা তখন অতল সমুদ্রের একাংশ ছিল। ঋগ্বেদের আমলে বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ছিল অতল সমুদ্র। শুক্ল যজুর্বেদের যুগেও গণ্ডকী নদীর পূর্বদিক জলপ্লাবিত ছিল। মহাভারতিক কালেও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ ছিল সমুদ্রে লীন। স্ট্রাবোর ভারত ভ্রমণকালে (১৮-২৪ খ্রীঃ) সমুদ্রের লোনাজল প্রতিরোধের জন্য বহু নগরের চারিদিকে বাঁধ ছিল। হিউয়েন সাং সমতট ও কামরূপের মধ্যাঞ্চলে হাজার ক্রোশ ব্যাপী হ্রদ প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেনদ (সুন্দরবনের ইতিহাস; ২০০০:১৪)।

গঙ্গা নদীর একটি শাখা পূর্বদিকে পদ্মা নাম ধারণ করে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে এবং অপর একটি শাখা ভাগীরথী নাম ধারণ করে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার শাখা পদ্মা বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় অতি প্রাচীনকাল থেকেই তার দুই তীরে ক্রমাগত পলি সঞ্চয় করে একের পর এক ভূমি গঠন করেছে । এই পলি গঠিত ভূমির উপর প্রাচীনকাল থেকেই বহু নগর ও গ্রাম গড়ে উঠেছিল। আবার অতীতে ঘটে যাওয়া বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদির মতো নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই নগর ও গ্রামগুলি ধ্বংস হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে গঙ্গার অপর শাখা ভাগীরথী, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এই নদীর দুই তীরে অতীতে বহু জনপদ গড়ে উঠেছিল, পরে তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় । পরবর্তী কালে আবারও যখন চর জেগে ওঠে তখন ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন বসতিগুলির উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা নদীর মধ্যে গঠিত হওয়া জঙ্গলাবৃত ভূমিভাগ হলো বর্তমানের সুন্দরবন।

পলিমাটির দ্বারা গঙ্গা নদীর মোহনায় যে অসংখ্য ছোট-বড় চর জেগে উঠেছিল সেই চরগুলোতে ধীরে ধীরে গরেওঠা জঙ্গল হাসিল করে পরবর্তীকালে পুনরায় সেখানে মানব বসতি গড়ে উঠেছে। এই দ্বীপগুলিতে ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে অসংখ্য নদী ও তার শাখা নদীর উৎপত্তি বহু আগেই হয়েছিল। নিম্নবঙ্গের এই অঞ্চলের গঠনের পর ভূমিভাগ কোথাও পরবর্তীকালে জঙ্গলাকীর্ণ রয়েগিয়েছে আবার কোথাও লোকবসতি গড়ে উঠেছে কোথাও বা শাখা নদীগুলি মজেগিয়ে ছোট-বড় নানা আকারের হ্রদে পরিণত হয়েছে। এই ভাবে পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী স্থানে বড় আকৃতির ভূমিভাগ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

বৈদিক যুগের গ্রন্থসমূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, বঙ্গ, মগধ, ও চের নামে তিনটি

দেশ ছিল এবং এই তিনটি দেশের অধিবাসীরা দুর্বল এবং অসভ্য ছিল। তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতো। ঐত্রেয় আরণ্যক গ্রন্থে লেখা আছে যে এই অঞ্চলের লোকেরা খাদ্যদ্রব্যের কোনো বাছবিচার করত না এবং যাহা পাইত তাহাই খাইত। অর্থাৎ এই অঞ্চলে আর্য জাতির আগমনের পূর্বে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তাকেই এই অসভ্য জাতি বলা হয়েছে । মহাভারতে ও রামায়ণের বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখে দেখা যায়। রামায়ণের যুগে মিথিলা, পৌন্ড্রবর্ধন, অঙ্গ, মগধ, কোশল প্রভৃতি দেশের অস্তিত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বঙ্গের অধিবাসীদের দর্শ বলা হয়েছে। মহাভারতে সমুদ্রতীরবর্তী বঙ্গের অধিবাসীদের দাস্য বলা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়, তিনি গয়ার নিকট নিরঞ্জনা নদীর তীরে সিদ্ধিলাভ করেন। এ কারণে উক্ত স্থানের সন্নিকটে বিহারের অন্তর্গত পাটলিপুত্র, নালন্দা প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করেছিল। বঙ্গদেশ এই স্থানের খুব কাছে। হিউয়েন শাঙের বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব এই দেশে এসেছিলেন এবং তার ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল এবং বুদ্ধদেবের বাণী বঙ্গদেশ থেকে ব্রহ্ম ও সিংহলে প্রচারিত হয়েছিল। যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বছর পূর্বে সম্ভবত এদেশে আর্য সভ্যতার পত্তন হয়। তারও আগে এ অঞ্চলের জনগণ ও আদিম অধিবাসীরা সমুদ্রতীর ও সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করত। রাহুল সাস্কৃত্যায়ন রচিত তভোগলা থেকে গঙ্গাদ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে- আর্য জাতির আগমনের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে অনার্য জাতির বসবাস ছিল। আর্যদের আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলগুলিতে কিছু সভ্য জাতিরও বাসভূমি ছিল বলে অনেক গ্রন্থাগার মনে করেন। এই সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে দামিল, নিষাদ ও কিরাত জাতি ছিল উল্লেখযোগ্য (সুন্দরবনের ইতিহাস-এ.এফ.এম. আবদুল জলিল ;২০০০:২২১-২৬)।

পশ্চিমবঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল তথা প্রত্নসমৃদ্ধ সুন্দরবনে কয়েকটি প্রত্নস্থল ছাড়া তেমন একটা প্রত্ন উৎখনন না হওয়ায় এ অঞ্চলের আদি ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য আমাদের বিভিন্ন লিখিত তথ্য তথা রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ এবং কয়েকটি বিদেশি লেখকদের লিখিত তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই অঞ্চল থেকে যা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে তার যুগবিচারের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই একমাত্র কয়েকটি লিখিত উপাদান থেকেই এই অঞ্চলের আদি ঐতিহাসিক যুগের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

রামায়ণে দেখাযায় যে, মহর্ষি কপিল দক্ষিণ বঙ্গের এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। ইক্ষাকু বংশের রাজা সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কপিলের আশ্রমে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহর্ষি কপিলের রোষে রাজা সগরের সমস্থ সৈন্য নিহত হয়েছিলেন। পরে রাজা সগরের পৌত্র দিলীপের সঙ্গে মতবিনিময়ে এই অঞ্চলে গঙ্গা আনয়নের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যজ্ঞাশ্ব মুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই বংশের ভগীরখ আনীত গঙ্গা এই অঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবল স্রোতস্বিনী রূপে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। এই গঙ্গানদীর মোহনাতেই বা গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম ছিল। বর্তমান তির্থক্ষেত্র থেকে কয়েক কি.মি. দক্ষিণে মূল আশ্রমটি ছিল, যা সমুদ্রগ্রাসে নিমজ্জিত হয়েছে। এছাড়া মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সাগরসঙ্গমে তীর্থস্নান এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে ভীম উপকূলীয় দক্ষিণবঙ্গের ছোটছোট রাজ্যজয় করেছিলেন বলে জানা যায়। (কৃষ্ণকালী মন্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাকথা, ২০০২, পৃঃ-৫০)। এক্ষেত্রে মনে হয় যে, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে ভৌগোলিক ভাবে এই দক্ষিণবঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় উপকূলীয় দ্বীপগুলিতে হয়ত ছোট ছোট গোষ্ঠী রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এই অঞ্চলে প্রবল পরাক্রান্ত গঙ্গারিডিদের কথা জানা যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে (কুষাণ যুগে) টলেমি গঙ্গার মোহনার সমীপবর্তী প্রদেশ গঙ্গারিডিগণের মূল বাসভূমি বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই গঙ্গারিডির রাজধানী 'গঙ্গা' নগরে এদের রাজা বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। টলেমি তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন যে, গঙ্গা নদীর মোহনা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সাগরে পড়েছে। তিনি তাঁর নকশায় এই পাঁচটি ধারার গতিপথ দেখিয়েছেন। এই পাঁচটি ধারার মধ্যে সর্ব পশ্চিমে যে ধারাটি রয়েছে তা হল 'কংসাবতী' (Cambysum)। এই ধারার পশ্চিম তীরে রয়েছে তাম্রলিপ্ত (Tamalites) বন্দর। যাইহোক এই কংসাবতী হল দক্ষিণবঙ্গের একটি সীমানা। অপরিদকে টলেমি বর্ণিত গঙ্গার মোহনার পাঁচটি ধারার মধ্যে যে ধারাটি পূর্বদিকে রয়েছে তা হল টলেমির ভাষায় 'অ্যান্টিবোল'। ভূগোল ও ইতিহাসবিদদের মতে এটি পদ্মা-যমুনা-বুড়িগঙ্গা- মেঘনার সম্মিলিত একটি ধারা। অর্থাৎ এই ধারাটি গঙ্গারিডিদের পূর্ব সীমানা। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের একজন গ্রিক নাবিক তাঁর 'ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের পথ নির্দেশিকা' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই অঞ্চলে 'গঙ্গে' নামক জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই জনপদ গঙ্গা তীরে অবস্থিত। এই জনপদে হাট-শহর (Market-town) বা বাণিজ্য নগরীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন (গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা; ১৯৮৮:২১)।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ১৯৪৭ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের' ১০ম অধিবেশনে এই গঙ্গে বা গঙ্গানগরকে প্রাচীন গঙ্গাসাগর সঙ্গমের তীর্থনগর বলে উল্লেখ করেছেন (শ্রী নরোত্তম হালদার; ১৯৮৮:১৯-২০)। অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গাসাগরকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ জনপদ গড়ে উঠেছিল। এবং দক্ষিণবঙ্গের বৃহৎ অংশ তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বৃহদাংশ এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কিছু অংশ (পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন) এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঙ্গারিডি নামক যে প্রাচীন এক যোদ্ধেয় জাতির কথা বলা হয়েছে এই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এই জাতির বসতি ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। শ্রীনরোত্তম হালদার মহাশয় তাঁর 'গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তডঃ

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও যেভাবে টলেমির নকশায় গঙ্গার পঞ্চ মোহনার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তাতেও সমগ্র গঙ্গোপদ্বীপই (Gangetic delta) গঙ্গারিডি রাজ্য হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়দ (গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা; ১৯৮৮:২১)।

শ্রী নরোত্তম হালদার মহাশয় তাঁর 'গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে এই গঙ্গারিডিদের সামরিক শক্তি বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা হল- ''মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, গঙ্গারিডিদের বিশালকায় রণহস্তী প্রচুর ছিল, সে জন্য কোনো বিদেশী রাজা এদেশ জয় করতে পারেনি; কারণ অন্যান্য জাতিসমূহ সেই অত্যাধিক শক্তিশালী অসংখ্য রণহস্তীর কথা শুনে ভয় পেত। ডিওডোরাস তাঁর বিশ্ব ইতিহাসে মেগাস্থিনিসের এই উক্তি সমর্থন করেছেন এবং আরও সুস্পষ্টরূপে লিখেছেন যে, অ্যাসিডনবাসী আলেকজান্ডার প্রায় সমগ্র এশিয়া জয় করেও কেবল গঙ্গারিডিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়েছিলেন; কারণ তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকে পরাস্ত করে সমগ্র সৈন্যবলসহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন যে গঙ্গারিডিদের সর্বাপেক্ষা রণনিপুণ চার হাজার হস্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে একথা শুনেই তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করলেন" (গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা; ১৯৮৮: পৃঃ- ২৬-২৭)।

শ্রী নরোত্তম হালদার মহাশয় তাঁর বর্ণনায় আরও বলেছেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কার্টিয়াস রুফাস তাঁর 'লাইফ অব আলেকজান্ডার'-এ গঙ্গারিডি এবং প্রাসী নামক দুই জাতির অধীশ্বর অ্যাগ্রামেসের ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ চার ঘোড়ার রথ ও ৩,০০০ রণহস্তী যুদ্ধের জন্য সর্বদায় প্রস্তুত ছিল। এক্ষেত্রে Agrammes বা Xandrames 'ঔগ্রসেন' নামের বিকৃতি; তিনি ছিলেন 'উগ্রসেনের পুত্র' অর্থাৎ মগধরাজ মহাপদ্মনন্দের পুত্র 'ধননন্দ'। যদিও প্লটার্ক গঙ্গারিডির রাজা ও প্রাসীর রাজার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বলেছেন-৮০,০০০ অশ্ব, ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮,০০০ রথ এবং ৬০০০ রুণহস্তী (গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা, ১৯৮৮, পৃঃ-২৭)।

খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকে ভারতীয় মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ এই অঞ্চলের নৌযুদ্ধ নিপুণ অধিবাসীদের উল্লেখ রয়েছে। রোমের শ্রেষ্ঠ কবি ভার্জিলের কাব্যে গঙ্গারিডিদের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক উক্তি আছে, যার বাংলা অনুবাদটি হলো-

''আমার দুয়ার ভরি রাখিব উৎকীর্ণ করি
নিটোল সুবর্ণ আর গজদন্ত সনে.....
গঙ্গারিডি রণে"।

(শ্রী নরোত্তম হালদার, গঙ্গারিডি আলোচনা ও পর্যালোচনা, ১৯৮৮, পৃঃ-২৮)

Mother's Daughter

Debleena Ghosh, Dept of Physiology

I am my mother's eldest daughter,
Bearer of her self-criticism, the weight I carry.
A mirror to her feigning smiles, a reflection so profound,
Yet flesh to her fangs, in silence I'm bound.
She tears me apart, comparing me to her past,
Her failed love life, a shadow that lasts.
It tears into my skin, burning my bones so deep,
Leaving behind ashes, a painful secret I keep.

"I will never become her," I often declare,
Yet slowly, unknowingly, her traits I wear.
I wonder why she demands love, her reason to survive,
Yet in return, venomous words, she must derive.
My father, he claims he never truly desired,
She's nothing but an obligation, a love expired.
My brother sees her as a thorn in his ambitions,
I say, "I am not you," with fierce determinations.
I'll never love a man, a lost cause in her eyes,
Yet I love and resent her, a paradox that lies.
For bringing me into this dysfunctional family,
I'm a product of you, a complex reality.
I yearn for her freedom from these familial ties,
But the thought of letting her go, my heart denies.
She's my mother, a part of me, intertwined so tight,
Losing her would mean losing my anchor, my guiding light.

Sati, Widow and Public Woman in ancient India

Sutapa Mukhopadhyay
Dept. of History

It was a long voyage to reach the harbour of 1829 when sati custom was officially banned in India. It was a practice which had its history since ancient time. If we look back to the path of history we can get a glimpse of it, though not the whole spectrum. There must have some primitive belief that the life after death was a continuation at another world where the dead male person had to be provided with all material needs along with wife, servants, food etc. It was practiced in many parts of the ancient world. It was a woman who had to face the most of the challenges provided by the society and she was the one who was named either as sati, widow or a public woman.

Sati- this is an old concept in India which binds the women in a single frame of loyalty to the husband. It was the irony that women were supposed to show their loyalty even to the dead husband by attending certain norms decided by the society amongst which sati was the highest form of fidelity. The institution of Sati was a complicated phenomenon. Multifarious forces and factors contributed to the development of this practice in India. Since the later vedic period there was progressive decline of the position of women. Dissatisfaction over the birth of female child led to the negligence of their education which basically was an indication of denial of their individual existence. Fidelity and Chastity on the part of women were emphasised greatly. In Vishnu Smriti we come across the two alternatives for women — either a life of strict celibacy or self-immolation. Till 300 AD widow's right of property was not recognised by the legal writers. Vishnu Smriti first talked about this. However in general, vested interests were determined to get rid of a widow to keep the property in their own hand. So economic conditions of the society contributed to the development of the institution of sati. With the development of the concept of private property war became common in the society. It was woman who had to bear the brunt of the crisis heavily as she was thought to be vulnerable. The captive wives of the fallen warriors had to serve and attend the winner and were treated as concubines. Sometimes self – immolation of the wives was preferred by the family than humiliation. Sati was practiced by the Rajputs and it was projected as an honourable alternative to being captivated by the enemies. In a custom that arose out of socio- economic circumstances and political tension, there needed a mask of religious sanction and morality. Practice of Sati was eventually glorified by some writers like kalidasa, Vatsayana, smriti composers. It was marked as the way of attainment to heaven, re-union with the dead husband, liberation from all earthly sins of the couple and their families. It galvanised the widow to prefer self- immolation to socio- economic humiliation. If we look at the position of the widows in ancient society the picture will be clearer about the development of the institution of Sati.

The Sanskrit word vidhaba connotes a woman whose husband is not alive and who has not married again. It is a very old word which can be traced beyond the vedic language to Indo-European origin and word exits with little modifications in most of the languages of Indo-European groups. The word Abidhaba or not widowed was commonly used in the vedic literature. The vedic Aryans as a pastoral folk gave some importance to women. Men were mostly engaged in military pursuits and they had to depend on the help and cooperation of women in other spheres of life. They were considered as the useful member of the society whose help was needed for material prosperity. They took part in different aspects of economy. The cheap or forced labour was not available to the early Aryans. Hence the male folk could not ignore the women with contempt. The exigencies of the political situation in the vedic period were responsible for the absence of the Sati system and sanctioning of the Nyiogo system and widow

remarriage. The need of the clan to produce mighty sons to face the wars gave the women a relatively better status. It was the necessity of the hour to have sons to dominate the other clan and the non- Aryans. The idea of propagation and multiplication of race was so strong in the early phase that the widows were allowed to raise children through the system of Niyogo or levirate. The wife of a dead or impotent man was allowed to have conjugal relations with her brother- in- law or some near relation to produce son for the sake of the family. However with the society getting complex and the increase of private property, availability of cheap labour and changing economic and political scenario the status of women started deteriorating. Women were deprived of education. The system of Niyogo and widow remarriage was condemned by the law maker of the new days. The sons born out of Niyogo system were called khetraja who were given an inferior status. Gradually the system went out of vogue. The widow lost her social status. The individual existences of women were denied. The widow was instructed to maintain a life of strict celibacy. Manu emphasised the idea which was repeated by Brihaspati. In Vishnu Smriti a widow was recommended only two paths which were either self- immolation or strict celibacy. Several restrictions were put on the way of living of the widows. They were deprived of earthly enjoyment. Food and pattern of living were changed with the loss of husband. Her health, beauty and desire were at stake. She was marked as inauspicious by the society. The term abidhoba clearly marked a widow's position in the society. A secluded life for her made her position in the society as insignificant. Only after 200 AD the question of widow's right of inheritance of property saw some light. Gautama proposed to treat widow as the co heir with other sapinda relations. Vishnu asserted that she should be the social heir in absence of son. Yangnavalka also championed the right of property of the widow. But society was in a dilemma for a long time. The law makers like Narada and Katyayana strongly opposed the widow's property right. In spite of strong advocacy for the betterment of the status of the widows it took several centuries to earn their inheritance right in India which was accepted by the society.

No discussion of the position of women in ancient India would be complete without reference to the women who had to face the exploitation of the patriarchy in a different way. Reference of public women can be noted as early as the time of Rik veda. The terms like Hasra, Agru and Sadharani in the Rik veda were used to denote a public woman. In the Atharva veda we come across the term Pumscholi. The Samhita literature made mention of the word Samanya and Taittira Brahmana coined two new words Atiskadvari and Apaskadvari which means one who transgresses rules. Another term was vrajayitri who entertains and gives enjoyment. The Pali literature called them Muhuttika who is a momentary partner. The Jataka literature coined the terms like Rupadasi, Nagarasobhini and Janapadakalyani. Along with those words came the terms like Kulota, Sairini, Barangana, Barabanita, Swadhinjouvana etc. In the Kamasutra of Vatsayana we come across the terms Ganika and Rupajivi. Actually there were gradations among the public women made by the society. There were ordinary herlots or veshyas and the accomplished courtesans or Ganikas. The ordinary herlots did not possess artistic talents like Ganikas. They had to entertain any guest who would pay the fees. Another class of public women was the temple dancer. We get the reference in the Jogimara inscription of 3rd century BC where the name of a temple dancer or devadasi is mentioned. Kalidasa refers to the girls employed in the Mahakal temple of Ujjaini. Huen Tsang noticed that in a Sun temple in Sindh there was a constant succession of females performing music and dance. The introduction of dancing girls in the temple tended to lower their moral and spiritual atmosphere. They sometimes became the real attraction for the people to visit temples. They were sometimes used by the priest, king or the nobility. The process was legally prohibited in 1929. There were certain causes for the development of the institution of public women. Since the vedic period there prevailed the custom of giving women as gifts. Many of such hapless women turned into public women. Poverty, hunger, natural calamities made the position of women vulnerable. Their displacement

and rehabilitation as prostitute was a common practice. Sometimes the strict rule of celibacy led them to break the norms of the society. Vatsayana informed that many widows used to stay with the wealthy people as their mistress when they failed to follow celibacy. Any transgression from strict morality enjoined for wives and their social ostracism also forced them to take the profession of public woman. One of the major causes that led to the degradation of women in the society was the war factor. War captive women were reduced to prostitution. War made the position of women vulnerable which drove them to accept the Sati system or the life of a prostitute. Society maintained an ambivalent attitude towards public women. On the one hand state encouraged this institution and for revenue and gathering various informations and on the other hand they were treated with contempt and despise. Visit to a prostitute was considered as sin. Still the society accepted their existence.

In ancient India like other patriarchal societies the birth of a girl child was not a welcoming event in the family in most of the time. The Atharva veda was a prime example where charms and rituals were mentioned to ensure the birth of a son. In the literature of the later period the birth of a son was desired. Gradually women became the victim of social abuses. Denial of education was a major factor for their degradation in the society. The demeaning custom like Sati was glorified as their way to salvation. With the introduction of strict celibacy-based widowhood women became the object of another type of exploitation in the society. The evolution of state in Ancient India further degraded their status. The state encouraged the existence of the institution of public women who were at the same time looked down upon by the society. Women's status as Sati, Widow and Public Woman was interrelated. Abolition of the Sati custom in 1829 prevented legally the burning of the widows, but they were exploited by the society. With the effort of the protagonist of widow remarriage the act was passed on 1856 which nodded for the remarriage of a widow. The legislations definitely improved the status of the women in the society. In spite of that, new ways of exploitation and degradation of the women show that society has a long way to go to improve the status of the women.

REFERENCE:

- Altekar A.S. 1987, The Position of Women in Hindu Civilisation: From Prehistoric Times to Present Day. Delhi: Motilal Banarasidas.
- Connnell R.W.,1987, Gender and Power: Society, The person, and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press.
- Kumar, Nita (ed),1994, Women as Subjects: South Asian Histories. New Delhi: stree.
- Lerner, Gerda, 1986, The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press. Roy Kumkum (ed), 1999, Women in Early Indian Societies. New Delhi: Manohar.

GO GREEN: A CASE STUDY OF SELECTED INDIAN COMPANIES

DR. SWEETY SADHUKHAN

Department of Commerce

Introduction:

Green Marketing has emerged as an important concept in India as in other parts of the developing and developed countries. There has been a change in consumer attitudes towards a green lifestyle. Green marketing can be defined as, **"All activities designed to generate and facilitate any exchange intended to satisfy human needs or wants such that satisfying of these needs and wants occur with minimal detrimental input on the national environment."** The companies are actively trying to increase their impact on the environment. Organizations and business however have seen this change in consumer attitudes and are trying to gain an edge in the competitive market by exploiting the potential in the green market industry. This paper focuses on the importance of green marketing and also describes the various initiatives introduced by selected companies for promoting green marketing-revolution.

Green Products and their Characteristics:

The products those are manufactured through green technology and that caused no environmental hazards are called green products. Promotion of green technology and green products is necessary for conservation of natural resources and sustainable development. We can define green products by following measures:

- Products those are originally grown with natural ingredients,
- Products those are recyclable, reusable and biodegradable,
- Products containing recycled contents, nontoxic chemical,
- Products contents under approved chemical,
- Products that do not harm or pollute the environment,
- Products that will not be tested on animals,
- Products that have eco-friendly packaging i.e. reusable, refillable containers etc.

Companies Involved in Green Marketing:

ITC Limited

ITC strengthened their commitment to green technologies by introducing 'ozone-treated elemental chlorine free' bleaching technology for the first time in India. The result is an entire new range of top green products and solutions: the environmentally friendly multi-purpose paper that is less polluting than its traditional counterpart.

Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL)

Adjudged the best performer in the 2009-2010 Green Business Survey, TNPL was awarded the Green Business Leadership Award in the Pulp and Paper Sector.

Tata Metaliks Limited (TML)

Every day is Environment Day at TML, one of the top green firms in India. A practical example that made everyone sit up and take notice is the company's policy to discourage working on Saturdays at the corporate office. Lights are also switched off during the day with the entire office depending on sunlight.

State Bank of India

SBI entered into green service known as "Green Channel Counte". SBI is providing many services like paper less banking, no deposit slip, no withdrawal form, no checks, no money transactions form.

HCL Technologies

HCL is committed to phasing out the hazardous vinyl plastic and Brominated Flame Retardants from its products and has called for a Restriction on Hazardous Substances (RoHS) legislation in India.

Oil and Natural Gas Company (ONGC)

India's largest oil producer, ONGC, is all set to lead the list of top 10 green Indian companies with energy-efficient, green crematoriums that will soon replace the traditional wooden pyre across the country.

Hero Honda Motors

Hero Honda is one of the largest two-wheeler manufacturers in India and an equally responsible top green firm in India.

Wipro Infotech

India's first company to launch environment friendly computer peripherals. For the Indian market, Wipro has launched a new range of desktops and laptops called Wipro Greenware.

McDonald's Green Revolution

McDonald's replaced its clam shell packaging with waxed paper because of increased consumer concern relating to polystyrene production and Ozone depletion. McDonald's restaurant's napkins, bags are made of recycled paper.

Coca-Cola's Environmental Initiative

The Coca Cola Company is one of the largest worldwide beverage retailers, manufacturers, and marketers of various non-alcoholic beverages. They maintain a large focus on the environmental impact of their products and use different methodologies and initiatives in order to reduce waste and sustain the environment.

Tata group of companies

Tata Motors ltd. has developed their showroom by using green items and elements in its design. It shows eco-friendly atmosphere that attracts people towards itself. They are also going to launch a low-cost water purifier which is made of pure and natural ingredients.

Digital tickets by Indian Railways

IRCTC has allowed its customers to carry PNR no. of their E-Tickets on their laptop and mobiles. Customers do not need to carry the printed version of their ticket anymore.

Lead Free Paints from Kansai Nerolac

Kansai Nerolac has worked on removing hazardous heavy metals from their paints. The hazardous heavy metals like lead, mercury, chromium, arsenic and antimony can have adverse effects on humans. Lead in paints especially poses danger to human health where it can cause damage to Central Nervous System, kidney and reproductive system.

Mahindra & Mahindra (M&M)

It is a prominent automobile manufacturer in India, has undertaken several green marketing initiatives to promote sustainable transportation and reduce environmental impact.

Conclusion:

Green marketing is a relatively quiet recent phenomenon and it is growing awareness amongst consumers and businesses about minimizing the adverse impact on the environment. Environmental issues are given more importance these days. This paper helps us to know the various practices made by companies for promoting green environment and also aimed at transforming the consumer minds and their perceptions towards environment.

A Dream in Three Parts

Anindita Mitra, Dept. of English

Yesternight I dreamt.
It was an all-night affair
And unlike most other dreams,
I remembered every bit of it clearly
When I woke up today
Exhausted.
Needless to say they were nightmares
All three of them.
Those who know me, would know
I never dream happy
Even when I am.

I slept at around midnight
To find myself in a big hall
Full of men and women
All dressed for some occasion.
But I was ready to leave, when
A hand tapped on my shoulder
And a voice said,
“Be careful while you step outside.
It’s all mud and water there.”
It was a woman’s voice, I think...
She and I started to search for ways
To go out of the hall
But everywhere we went
At every doorway
The puddles were knee-deep
And we started to drown.
But we never cried for help
At least, I didn’t.
Drowning I woke up
Sweaty...and gulped down water
To put myself to sleep again.

I am walking in an empty street.
The woman’s voice is there.
We are returning from somewhere
May be from that party.
But in front of us is something.
There are two men following
A woman! I nudge the voice,
“Something bad is going to happen.”
And instantly there’s a scuffle.
I hit my head on the pavement
And I wake up, yet again.

It’s 3a.m. now and I’m afraid
To close my eyes.
A crow is cawing
Sitting right outside my window.
I close it and go back
To bed, to bed, to bed.
No, there’s no knocking at the gate.

I am at home.
I’ve hit my head.
I’m coughing up blood.
My parents see that
But are not concerned!
My father asks me to open my mouth.
It’s all blood!

I wake up.
It’s 5:10a.m..
It’s clear outside.
I sit right up on bed.
Let’s not sleep anymore tonight
For sleep comes to the blessed, right?

IMPACT OF ICT IN HIGHER EDUCATION

Dr. Deepa Roy
Department of Education

Today, Information and Communication Technology is a very crucial aspect of human life. It plays a silent and vital role in changing the socio-economic scenario. Education also reforms due to the impact of ICT. Information and communication technology gradually changed in working conditions, exchange of information, teaching methods, and learning style, and also help in scientific research. ICT believes that it can be empowered the teachers and students significantly enrich their learning achievement. However, there seems to be a contradiction between the methods used to measure impact and the learning to be promoted. For example, standardized testing measures the results of traditional teaching practices more than new information and skills related to the use of information and communication technology. ICT in teaching enables a more learner centred learning environment. Therefore, the world is rapidly changing towards the digital media and information, the role of ICT in education is growing, and this importance will continue to grow and develop in the 21st century. Every nation is obliged to educate people. This is their fundamental right. But this is not just the right to access education, but the right to receive quality education through quality teaching. Historically, education has been known as a socially oriented activity and a process of social empowerment. However, in the era of globalization, it has become a socio-commercial activity that has clearly begun to strengthen society by applying a combination of traditional and modern approaches. ITC in education simply means teaching and learning applying ITC.

Information and communication technology (ICT) is often associated with more complex and expensive computer technologies. However, information and communication technology also include more conventional technologies such as radio, television and telephone technology. Although definitions of ICT vary, it may be useful to adopt the United Nations Development Program (UNDP) definition: ICTs are essentially information processing tools - a variety of goods, applications and services used to store, process, share and exchange information. These include the ”old” information and communication technologies of radio, television and telephone, and the ”new” information and communication technologies of computers, satellite and wireless technology, and the Internet. These various tools can now work together to form our ”networked world” - a vast infrastructure of interconnected telephone services, standardized computing devices, the Internet, radio, and television that spans the globe. Since, ICT is not only the latest computer and Internet technology, it also simple audio-visual aids such as transparencies and slides, tape recorders and radios; videocassettes and televisions; and the movie. These older and better-known technologies are collectively referred to as “analogy media”, while newer computer and internet-based technologies are referred to as “digital media”.

ICT makes change the dynamic world. It should be influenced the academic aspects.

Because due to the impact of ICT helps teachers and students both of beneficial to their individual needs. ICT significantly facilitates the acquisition and assimilation of knowledge, providing developing countries with unprecedented opportunities to improve education systems. ICT integrates the various instruments in the academic fields. The purpose of this study is to discuss the benefits of using information and communication technology in education, to improve student learning and experience in some countries, to encourage decision makers, school administrations and teachers to Give the necessary attention to integrate this technology into their educational systems. In doing so, it highlights the advantages of ICT in education, the existing promises, and the limits and challenges of integrating educational systems.

Needs and Importance of ICT

Teachers were aware of the quality of their teaching. To improve quality, some teachers use teaching aids such as diagrams, models - static and working, samples, slides, etc., because teachers are trained in both the design and use of audio-visual aids. It is a known fact that most schools do not have adequate teaching aids related to school content. So, teachers do not have the possibility to use A-V aids during teaching. The use of A-V aids is further limited because unmotivated people become teachers. We understand the need to improve the quality of teaching with the help of television, where the most qualified teacher teaches the subject using the most appropriate teaching aids. This helped to improve the quality of teaching in schools where there are no teachers teaching the subject or less qualified teachers in schools with poor or non-existent teaching aids. in various languages. Even video learning materials were produced and made available to teachers; but most schools did not use them. Some of the reasons were lack of TV and VCR, lack of electricity, TV and VCR not working, which is not included in the schedule, lack of initiative by the teacher and director, etc. In addition to A-V aids, print media should improve the quality of teaching and learning. Currently, the printed study materials used in various programs of open universities are in modular form. All the above efforts have failed to improve the quality of education to the satisfaction of teachers, students, parents and other stakeholders. Looking for the most effective tools that teachers can use for quality teaching.

In the era of global competition, technology is the backbone of everything. Researchers, academics and industry professionals have demonstrated that ITC provides

opportunities for learning and success for all participants in education. Educational planners around the world have agreed that increased exposure of students to information and communication technology in education through curriculum integration has had a significant and highly productive impact on their achievement. Its exposure has significantly improved their knowledge, understanding, practical skills, presentation skills and innovation skills.

It strengthened and improved the skills, adaptability, knowledge and endurance of students and teachers. Compared to other industries, the impact of information communication technology (ICT) on education is underwhelming. This is due to many direct and indirect factors. The most obvious factors are inadequate technology introduction and progressive training, lack of proper teacher training, lack of motivation, time constraints, trained workforce in the field of education and lack of infrastructure in rural areas. However, due to increasing competition and market demand in the education sector, it shows progress and educational institutions gradually adopt ITC in the classroom, a learning environment to develop the efficiency and flexibility of information delivery and provide support for personalized training. programs that meet the needs. the need of individual students.

Blended Learning

The blended learning paradigm combines pedagogy, technology and students. With the help of E Technologies Solutions, teaching takes place face-to-face in the classroom. This concept combines pedagogy and educational technology to create synergy in learning. The teacher invests time and creates learning resources to monitor students and complete all quarters. Teachers create a dynamic learning atmosphere by providing e-learning material that arouses students' interest in learning. This strategy gives students flexibility in the time, place, path and pace of learning. Students decide what time, place and way they should study

Active Learning

The increased use of ICT in teaching has helped students in many ways. These students learn according to their preferences, needs and expectations. Use of ICT to control and use tools for

calculation. It enables relevant analysis and acts as an active learning platform where you can request and create new information for your own use. This allows them to learn in a way that is more relevant to their daily lives. With expanded learning responsibilities, ICT has transformed traditional rote pedagogy into better learning. It created a just-in-time learning system where active learners choose what they want to learn and when they need to learn it.

Collaborative Learning

Learners, teachers and experts have created a strong bond as a result of using ICT in teaching. It encourages their mutual interaction irrespective of caste, creed, creed or place. Educational ICT has created, offers and will continue to create opportunities for all participants in training, helping learners to form teams and improve communication skills and collective awareness. This type of cooperative learning is not limited to a specific age group; instead, learners can continue to learn throughout their lives. They can work with peers, experts and mentors from different fields in different parts of the world.

Integrated Learning

Educational ICTs have improved learning and raised the level of teaching. It advocated a thematic integration approach to teaching and learning rather than rote learning. ICT-integrated learning modules in education are basically thematically focused classes and are mostly delivered via the Internet. The course content is comprehensive and comprehensive in terms of the subjects. The content is also integrated into the language and helps students learn both the content and additional languages. This led to deep discussions and forced teachers to coordinate, transform and constantly update their pedagogical models with the subject. This module also removes the artificial distinction between different academic disciplines, theory and practice.

Innovative Learning

ICT in education has provided a common platform for all academic actors. It helped the teacher to develop with his students as a fellow learner, an innovative learner & a creative learner by exploring the subject content in depth. Teachers can connect with a global academic network to develop creative and innovative pedagogical approaches and content. With the use of educational ICT, the teacher can share his creative and innovative opinions with the teaching community and students. ICT-enabled learning promotes innovation among educators. It can collect available information and reframe it and present it in creative and innovative ways.

Smart Learning

Mobile phones are mini computers and facilitate all academic participants in many ways. It emerged as the most competitive learning. The educator must develop new and expanded learning models that effectively combine pedagogical strategies. The newly created content design of mobile learning must take into account the required main results, futuristic pedagogy and educational ethics, and cost-effectiveness. In mobile learning, the important factors of pedagogy are integration, support, interactive use and appropriate selection of tools.

ITC enable Teaching

The study was made possible thanks to the use of information and communication technology (ICT) in the classroom. Teachers can use the information gathered about student

learning to make academic and non-academic recommendations. ICT helps teachers create personal connections with students and give them personal feedback on their performance.

Teachers can help students by providing additional learning materials and guiding them to use academic opportunities for overall growth and development using educational ICT

Teachers can use information technology to assess a student's level of knowledge, motivation, and academic interest, and then guide them accordingly. The use of CT acts as a catalyst for intentional planning that leads to improved student learning outcomes. The trainer can use the latest ICT technology to assess the efficiency and overall performance of the students. students. Teacher knows how to assess which technology application is important and show the relationship to improving student learning. With the help of ICT based collected information, educators can change, plan and modify their teaching content, attitude and approach to realize progress, develop efficiency and consistency of teaching practice. ICT tools can also provide a personalized and connected experience for all students. The trainer

can develop a strategic pedagogy with the help of educational ICT. With well- defined learning goals in mind, the trainer can collaborate with online solutions and facilitate students in person. With the help of ICT, the educator can assess the student in preliminary studies and support the student individually according to strengths & weaknesses. ICT has enabled educators to be an even more responsive and accessible tool in the student support system.

ITC in Teacher Training

- ❖ Teachers are no longer disseminators of information, but proactive teacher
- ❖ Redefining the role of the teacher in the new information age.
- ❖ Teacher quality as a predictor of learning, thus emphasizing the importance of teacher education - which in this respect is the role of ICT as a tool to facilitate the teacher education.
- ❖ Bringing teachers to ICT rather than bringing ICT to teachers - important in developing countries.

CONCLUSION

Since, the study finds out the use of the Internet and other ICT for lesson preparation, the majority of the interviewed teachers admitted that they never or rarely use it, while only a few used the Internet occasionally or regularly to gather information. Teachers in particular felt that they did not have enough access and training and therefore could not use the Internet and other opportunities. However, more teachers were satisfied with the use of computers as individuals than as teachers. A positive observation is that all those teachers who are not very familiar with computers and other technologies expressed interest in the same training. They felt that if they were educated, they could take advantage of the resources available at school. The support of school administrators and, in some cases, of the community is crucial for the effective use of ICT. The teachers must have sufficient opportunities to use functional computers (or other technologies) & adequate technical support. Changing pedagogy, redesigning curricula and assessment tools, and increasing the autonomy of local schools promote the optimal use of information and communication technology in education. There are very few examples of ICT integration in the classroom, although some schools use audio-visual aids and integrate the teaching of some lessons. In most cases, even if ICT is used in lessons, it is still mostly a source of information & not a core part of the learning process.

REFERENCE

1. Abbott, C. (2018). *"ICT: Changing Education."* ISBN- 9781138347588: Routledge (Manohar).
2. Alam, M. MD. (2016). *"Use of ICT in Higher Education.* The International Journal of Indian Psychology." ISSN 2348-5396 (e) | ISSN: 2349-3429 (p) Volume 3, Issue 4, No. 68, DIP: 18.01.208/20160304 ISBN: 978-1-365-39398-3 http://www.ijip.in

3. Fu, J.S. (2013). *"ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implication."*: International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2013, Vol. 9, Issue 1, pp. 112-125. https://files.eric.ed.gov
4. Manikananda, P. & Dhanalaxmi, K. (2015). *"ICT in Higher Education."* ISBN- 978-93855477959: Bonfiring Technology Solutions Publisher.
5. Sengupta, E. & Blessinger, P. (2022). *"ICT and Innovation in Teaching Learning Methods in Higher Education: 45 (Innovations in Higher Education Teaching and Learning)."* ISBN- 13- 978-1800432659: Emerald Publishing Limited.
6. Serhan, D. (2009). *"Preparing pre-service teachers for computer technology integration.":* Internation Journal of Instructional Media 36(4):493-447. www.researchgate.net
7. Shanmugam, A.P. (2021). "*ITC Resources and Higher Education."* ISBN-13: 978-9388694117: MJP Publisher.
8. Shukla, B. (2022). *"ICT in Education-Vision & Realities."* ISBN- 978-8171328819: Agarwal Publisher.
9. Sivakumar, D & Jayakumar, R. (2018). *"ITC in Education."* ISBN- 978-8171328819: Pointer Publisher.
10. Zahaar, N. & Ahmad, J. (2023). *"ICT Integration in Education: Challenge and Prospects."* ISBN-13- 978-9391978211: Shipra Publication.

Traditional Tribal Knowledge : A Treasure Trove of Science in West Bengal, India

Dr. Mousumi Roy
Department of Zoology

Traditional tribal knowledge, often referred to as Indigenous Knowledge (IK) or Traditional Ecological Knowledge (TEK), encompasses a vast body of understanding about the natural world accumulated over generations through direct observation, experimentation, and cultural transmission. This knowledge system, though often differing from scientific methods, offers valuable insights and practices relevant to various scientific fields, including ethnobotany which is the study of the relationship between plants and people. Tribal communities have a deep understanding of the medicinal properties of various plants, their uses in food preparation, and their cultural significance. This knowledge has led to the development of numerous traditional medicines and continues to inspire scientific research in the field of pharmacognosy. In ethnozoology where the study of the relationship between animals and people goes on. Tribal communities have extensive knowledge of animal behaviour, migration patterns, and their role within the ecosystem. This knowledge is crucial for sustainable resource management and conservation efforts.

Many tribal cultures have developed sophisticated astronomical knowledge systems for navigation, timekeeping, and predicting seasonal changes. Their observations of celestial bodies and interpretations of celestial phenomena often hold cultural and spiritual significance. Tribal communities have developed methods for weather forecasting based on observations of natural signs, such as animal behaviour, cloud formations, and changes in plant life. These traditional practices can contribute to a more comprehensive understanding of weather patterns. Tribal communities have also developed various agricultural techniques adapted to their specific environments. These practices often emphasize sustainable resource management, crop diversity, and integration with the natural ecosystem. India boasts a rich heritage of diverse tribal communities, each possessing unique and valuable knowledge systems developed through generations of living in close harmony with nature. While often overlooked in the modern world, their traditional knowledge demonstrates a deep understanding of various scientific principles, particularly in the areas of:

1. Ethnomedicine:

- Tribal communities utilize a vast array of plants and natural resources for medicinal purposes. Their knowledge base consists of over 8,000 plant species and 25,000 formulations used to treat various ailments.
- This knowledge is often passed down orally through generations, making it crucial to document and preserve it to unlock potential benefits for modern medicine.

2. Sustainable Agriculture:

- Tribal communities practice sustainable agricultural practices based on their understanding of soil fertility, crop rotation, and pest control.
- They employ techniques like burning crop residues (as natural fertilizer), planting diverse tree species, and applying farmyard manure to maintain soil health.
- These practices offer valuable insights for contemporary agricultural practices, promoting sustainability and environmental conservation.

3. Weather Prediction:

- Many tribes have developed intricate methods for predicting weather patterns based on observations of natural phenomena like animal behaviour, cloud formations, and wind patterns.
- This knowledge helps them prepare for potential natural disasters and make informed decisions about agricultural activities.

4. Conservation Practices:

- Living in close proximity to nature fosters a deep respect for the environment among tribal communities. They have developed various conservation practices like leaving portions of land fallow for natural regeneration and respecting specific hunting seasons.
- These practices promote biodiversity and ensure long-term sustainability for both the communities and the environment.

West Bengal, a state in eastern India, is home to a diverse population, including numerous tribal communities. As per the 2011 census, the tribal population in West Bengal is around 5.8% of the total population, constituting around 40 different ethnic groups. These communities are spread across the state, with a higher concentration found in districts like Darjeeling, Jalpaiguri, Alipurduar, Dakshin Dinajpur, Paschim Medinipur, Bankura, and Purulia. Here are some of the major tribes found in West Bengal:

- **Santals:** The Santals are the largest tribal group in West Bengal, making up over half of the total tribal population in the state. They are primarily concentrated in the districts of Birbhum, Bankura, and Purulia. Their language, Santali, belongs to the Austroasiatic language family and is spoken by over 7 million people worldwide.
- **Mundas:** The Mundas are another major tribe in West Bengal, inhabiting primarily the districts of Purulia, Bankura, and Medinipur. Their language, Mundari, is also part of the Austroasiatic family.
- **Oraons:** The Oraons are mainly found in the districts of Purulia, Bankura, and West Midnapore. Their language, Kurukh, belongs to the Dravidian language family.
- **Bhutias:** The Bhutias are a group of Tibetan people inhabiting the Darjeeling hills. Their language, Sikkimese or Dzongkha, is a Sino-Tibetan language.
- **Bhumijs:** The Bhumijs are primarily concentrated in the districts of Bankura, Purulia, and Medinipur. Their language, Bhumij, belongs to the Munda branch of the Austroasiatic language family.

The tribal communities of West Bengal play a significant role in preserving the cultural heritage of the state. West Bengal, with its diverse ethnic landscape, boasts a rich heritage of traditional knowledge, including ethnozoology – the study of human-animal relationships. Here's what we know about the ethnozoological practices of some tribes in West Bengal:

1. Food and Medicine:

- **Animals as food:** Tribes like the Paharia and Birhor use various insects, rodents, reptiles, and birds as part of their diet.
- **Animals in medicine:** Several tribes use various animal parts for medicinal purposes. For example, the Mech tribe uses snake bones for healing wounds, while the Oraon tribe uses honeybee stings to treat rheumatism.

2. Customs and Religious Practices:

- **Animals in rituals and ceremonies:** Animals play a significant role in various rituals and ceremonies. The Santhal tribe uses goats and chickens in sacrifices, while the Munda tribe uses specific bird calls for divination.

- **Totems and taboos:** Many tribes have totems, specific animals they consider sacred or representative of their clan. Additionally, taboos associated with certain animals exist, restricting their consumption or interaction.

3. Other Uses:

- **Animals for tools and ornaments:** The Santhal tribe uses hornbill beaks for ornaments, while the Munda tribe utilizes animal bones for tools.
- **Animals for entertainment and games:** Some tribes, like the Pauri Bhuiya, use birds for cockfighting and other recreational activities.

The tribal communities of West Bengal possess a rich repository of traditional knowledge on ethnozoology, which refers to the use of animals and animal products for medicinal purposes. This knowledge has been passed down through generations and is an integral part of their cultural heritage. Different tribes in West Bengal use animals and animal products in traditional medicine viz. the Santhals use honey extracted from wild beehives to treat coughs and colds. They also use the dried meat of monitor lizards to treat skin diseases. The Mundas use the ash of burnt crabs to treat wounds and ulcers. They also use the milk of a certain type of frog to treat eye infections. The Oraons use the bile of a monitor lizard to treat jaundice. They also use the fat of a sloth bear to treat rheumatism. The Birhors use the eggs of owls to treat asthma. They also use the dried meat of snakes to treat joint pain. It is important to note that these are just a few examples, and there are many other ways in which the tribes of West Bengal use animals and animal products in traditional medicine. It is also important to remember that traditional knowledge is not static and is constantly evolving. As the tribes of West Bengal interact with the outside world and gain access to modern medicine, their traditional practices may change or even disappear altogether. Therefore, it is important to document this knowledge before it is lost. Traditional tribal knowledge is not a monolithic entity and varies greatly across different cultures and regions. Additionally, it's crucial to approach this knowledge with respect and sensitivity, acknowledging the cultural context and ensuring informed consent when engaging with tribal communities and their knowledge systems. The integration of traditional tribal knowledge with Western scientific methods holds immense potential for advancing our understanding of the natural world and developing solutions to pressing environmental challenges. It's important to acknowledge that this is just a glimpse into the vast and complex science ingrained in tribal knowledge systems. Recognizing their value and fostering their integration with modern scientific advancements holds immense potential for creating a more sustainable and equitable future.

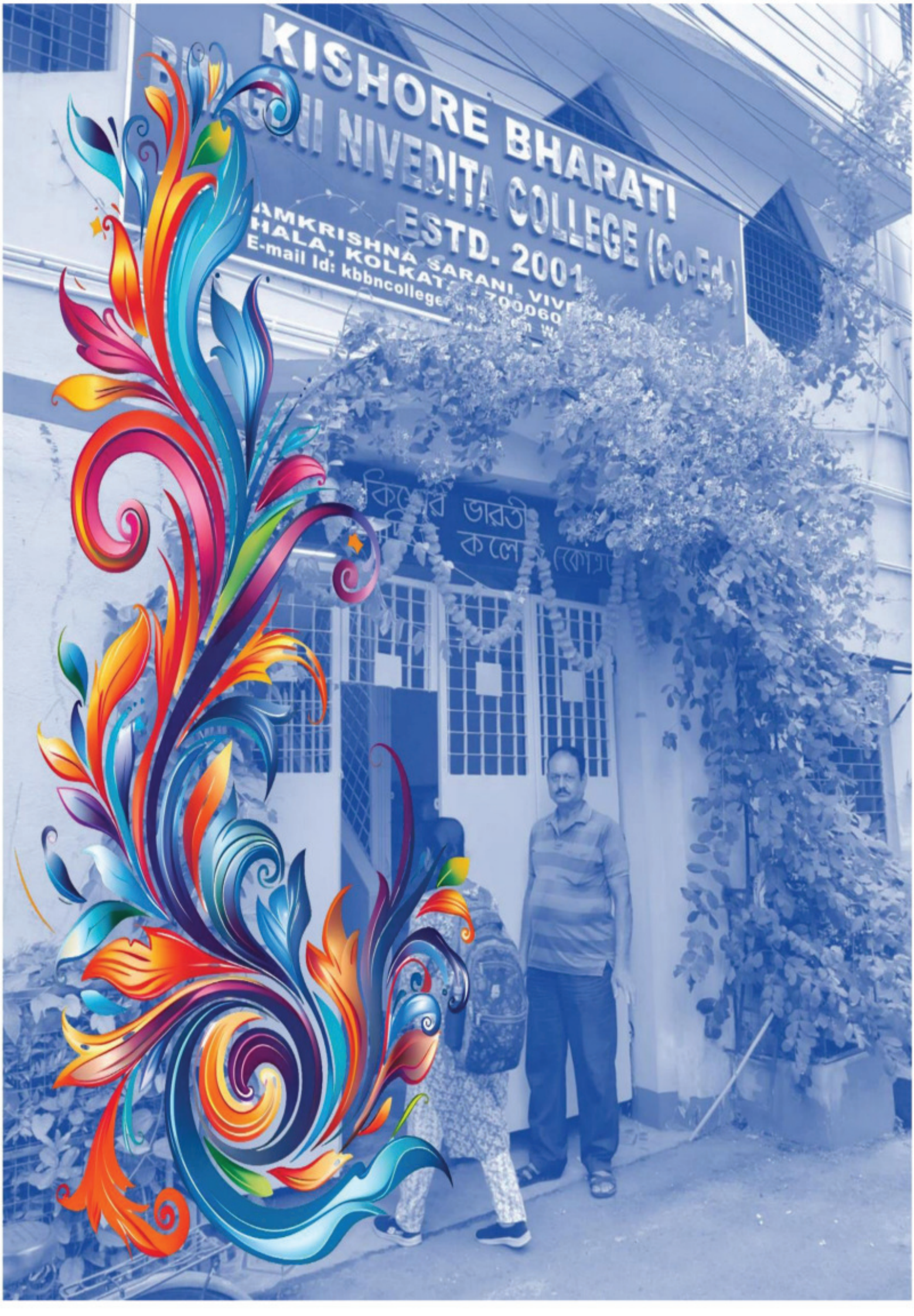
KISHORE BHARATI
NIVEDITA COLLEGE (Co-Ed.)
ESTD. 2001
E-mail Id: kbbncollege